ভক্তিযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

ভক্তিযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ- বিরচিত

ভক্তিযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

(ইংরেজী) দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে

বর্তমান গ্রন্থের পাঠক হয়তো অবগত আছেন যে, মহাপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের নামে যে-সকল গ্রন্থ আছে, ঐগুলির প্রায় সবই তাঁহার স্বল্পপরিসর কর্মময় জীবনে ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর সাঙ্কেতিক নোট হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। পূর্বে লিখিত নোট অবলম্বন করিয়া স্বামীজী কখনো বক্তৃতা দিতেন না, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া যাহা মনে উঠিত, তাহাই বলিয়া যাইতেন। স্বামীজী যখন লণ্ডনে প্রথম বক্তৃতামালা আরম্ভ করেন, তখন বর্তমান সম্পাদক তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন; প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীজীর দার্শনিক বক্তৃতাগুলির নোট গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সাঙ্কেতিক-লিপিকার পাওয়া প্রথমতঃ দুষ্কর ছিল—ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এজন্যই স্বামীজীর মার্কিন বন্ধুগণ একসময়ে তাঁহার মূল্যবান বক্তৃতাগুলি সংরক্ষণ-বিষয়ে হতাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল যে, বক্তৃতাগুলি মানব-কল্যাণের জন্য লিপিবদ্ধ হউক, এই নিঃস্বার্থ জীবনের কর্মপ্রচেষ্টাসমূহ চিরস্থায়ী হইয়া মানবজাতিকে শান্তিদান করুক—সেজন্যই যেন অবশেষে ইংলণ্ডের বাথ-নিবাসী পরলোকগত মিঃ জে. জে. গুডউইনের মতো একজন কৃতী সাঙ্কেতিক-লিপিবিদ্‌কে পাওয়া গিয়াছিল। মিঃ গুডউইন পরে স্বামীজীর অন্যতম অনুরাগী শিষ্যে পরিণত হন, এবং স্বামীজী যেখানে যাইতেন, তিনিও সঙ্গে যাইতেন। স্বামীজীর অসংখ্য বন্ধু, অনুরাগী ছাত্র ও শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এখনো জানেন না, এই নিরলস কর্মীর অমূল্য সেবার নিকট তাঁহারা কত গভীরভাবে ঋণী। স্বামীজীর মানবলীলা-সংবরণের প্রায় তিন বৎসর পূর্বে মিঃ গুডউইন ভারতে মহীশূরের অন্তর্গত উতকামণ্ডে আন্ত্রিক জ্বরে অকালে দেহত্যাগ করেন। গুডউইন এ শুভ কার্যে অগ্রণী না হইলে স্বামীজীর ইংরেজীতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী কখনো প্রকাশিত হইতে পারিত না, এবং মানবসমাজও এই অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইত।

সম্পাদকের ধারণা ছিল যে, সাধারণতঃ স্বামীজীর গ্রন্থাদি যেভাবে প্রকাশিত, বর্তমান গ্রন্থে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ স্বামীজী যখন প্রথমবার আমেরিকায় ছিলেন, তখন ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে এই গ্রন্থ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত বেদান্ত-মাসিক 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রথম বাহির হয়, এজন্য তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, এই গ্রন্থ স্বামীজী ঐ পত্রিকার জন্য স্বয়ং লিখিয়াছেন, কিন্তু আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, প্রথম যে-কয়েকটি অধ্যায়ে স্বামীজী শঙ্কর, রামানুজ ও অন্যান্য প্রাচীন আচার্যদের ভাষ্যসমূহ হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, সেই অধ্যায়গুলি ছাড়া সমগ্র গ্রন্থখানি ঐকালে নিউ ইয়র্কে শিক্ষার্থীদের নিকট প্রদত্ত 'ভক্তি' সম্বন্ধে ভাষণগুলি অবলম্বন করিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। সাঙ্কেতিক লিপিতে গৃহীত নোটগুলি পরলোকগত মিঃ গুডউইনের মতো একজন সুদক্ষ ব্যক্তিদ্বারা ভাষায় রূপায়িত হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু বাদ গিয়াছে, কিছু ভুলত্রুটি হইয়াছে এবং কোন কোন বাক্য স্থানচ্যুত হইয়াছে। এখানে সেখানে তাড়াতাড়ি একটু চোখ বুলানো ছাড়া স্বামীজী নিজে কখনো সাঙ্কেতিক লিপিতে গৃহীত নোটগুলির দিকে বেশি মনোযোগ দিতেন না এবং সর্বদাই বিশেষ ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া এবং কোন সময় ততটুকু না করিয়াও মুদ্রণের জন্য পাঠাইয়া দিতেন, এসব কারণে বিশেষতঃ যখন স্বামীজী আজ আমাদের মধ্যে নাই, তখন তাঁহার বক্তৃতাবলী পুনঃপরীক্ষা করিবার আয়াসসাধ্য গুরুদায়িত্ব সম্পাদকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

* * *

সুতরাং গ্রন্থের অনেক স্থানে অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য সম্পাদক ভাষা ও যতি-চিহ্নাদির ত্রুটিগুলি পরিবর্তন এবং নিজের কয়েকটি শব্দ-সংযোজনের কার্যে বাস্তবিক অত্যন্ত সংশয়াকুল চিত্তে অগ্রসর হইয়াছেন।

* * *

উপসংহারে সম্পাদক জানাইতেছেন, স্বামীজীর বক্তব্যের অর্থ যথাসম্ভব স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি সম্পাদনার কাজ করিয়াছেন, পাঠকের নিকট গ্রন্থখানি অধিকতর উপযোগী করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই এবং আশা করেন, ইহাতে সফলকাম হইয়াছেন।

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১৫ মার্চ, ১৯০৯

সম্পাদক
(সারদানন্দ)

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায় ॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥

শ্বেতাশ্বতর উপ., ৬।১৭-১৮

তিনি জগন্ময়, অমর, নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত, জ্ঞাতা, সর্বব্যাপী, এই জগতের পালয়িতা। তিনি অনন্তকাল জগৎ শাসন করিতেছেন। এই জগৎশাসনের অন্য হেতু কেহ নাই।

যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, মোক্ষলাভের ইচ্ছায় আমি আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই দেবেরই শরণ লইতেছি।

সূচীপত্র

ভক্তির লক্ষণ

অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। মুহূর্তস্থায়ী ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততা হইতেও শাশ্বতী মুক্তি আসিয়া থাকে। নারদ তদীয় 'ভক্তিসূত্রে' বলিয়াছেন, 'ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।' 'ইহা লাভ করিলে জীব সর্বভূতে প্রেমবান ও ঘৃণাশূন্য হয় এবং অনন্তকালের জন্য তৃপ্তিলাভ করে।' 'এই প্রেমের দ্বারা কোন কাম্য বস্তু লাভ হইতে পারে না, কারণ বিষয়বাসনা থাকিতে এই প্রেমের উদয়ই হয় না।' 'কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতেও ভক্তি অধিকতরা, কারণ সাধ্যবিশেষই উহাদের লক্ষ্য, কিন্তু ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য ও সাধনস্বরূপা।'[১]

আমাদের দেশের সকল মহাপুরুষই ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য, নারদাদি ভক্তিতত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যাতাগণকে ছাড়িয়া দিলেও স্পষ্টতঃ জ্ঞানমার্গ-সমর্থনকারী ব্যাসসূত্রের মহান ভাষ্যকারও ভক্তিসম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদয় না হউক, অধিকাংশ সূত্রই শুষ্কজ্ঞানসূচক অর্থে ব্যাখ্যা করিবার আগ্রহ ভাষ্যকারের থাকিলেও সূত্রগুলির—বিশেষতঃ উপাসনা-বিষয়ক সূত্রগুলির অর্থ নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে সহজে তাহাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা চলিতে পারে না।

সাধারণতঃ লোকে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যতটা পার্থক্য আছে মনে করে, বাস্তবিক তাহা নাই। ক্রমশঃ বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে একই লক্ষ্যে মিলিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ জুয়াচোর ও গুপ্তবিদ্যার নামে ছলনাকারীদের হাতে পড়িয়া রাজযোগ প্রায়ই অসাবধান ব্যক্তিদের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত

---

১ ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা।—নারদ-সূত্র, ১ম অনুবাক, ২য় সূত্র
ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ।—ঐ, ২ ৭
ওঁ সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।—ঐ, ৪।২৫
ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ।—ঐ, ৪।৩০

হয়। এরূপ না হইয়া মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলে রাজযোগও সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌঁছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা। কিন্তু উহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিম্নস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক গোঁড়ামির আকার ধারণ করে। হিন্দু-মুসলমান-ও খ্রীস্ট-ধর্মান্তর্গত গোঁড়ার দল—এই নিম্নস্তরের ভক্তিসাধকগণের মধ্যেই সর্বদা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত প্রকৃত প্রেম জন্মে না, সেই ইষ্টনিষ্ঠাই আবার অনেক সময় অন্য সকল মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপের কারণ। সকল ধর্মের ও সকল দেশের দুর্বল অপরিণতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ একটিমাত্র উপায়েই তাহাদের নিজ আদর্শ ভালবাসিতে পারে। সেই উপায়টি—অপর সমুদয় আদর্শকে ঘৃণা করা। নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধর্মাদর্শে একান্ত অনুরক্ত ব্যক্তিগণ অন্য কোন আদর্শের বিষয় শুনিলে বা দেখিলে কেন গোঁড়ার মতো চিৎকার করিতে থাকে, তাহার কারণ ইহা হইতেই বুঝা যায়। এরূপ ভালবাসা যেন প্রভুর সম্পত্তিতে অপরের হস্তক্ষেপ-নিবারণের জন্য কুকুর-সুলভ সহজ প্রবৃত্তির মতো। তবে প্রভেদ এই—কুকুরের এই সহজ প্রবৃত্তি মানবযুক্তি অপেক্ষা উচ্চতর; প্রভু যে বেশ ধরিয়াই আসুন না কেন, কুকুর তাঁহাকে কখনো শত্রু বলিয়া ভুল করে না। গোঁড়া কিন্তু সমুদয় বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলে। ব্যক্তিগত বিষয়ে তাহার দৃষ্টি এত অধিক যে, কোন্ ব্যক্তি কি বলিতেছে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা শুনিবার বা বুঝিবার কোন প্রয়োজন সে বোধ করে না; কিন্তু কে উহা বলিতেছে, সেই বিষয়েই তাহার বিশেষ দৃষ্টি। যে-লোক স্বমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের উপর দয়াশীল, ন্যায়পরায়ণ ও প্রেমযুক্ত, সে-ই নিজ সম্প্রদায়ের বহির্ভূত ব্যক্তিদের অনিষ্ট করিতে ইতস্ততঃ করে না।

তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই আছে—এই অবস্থার নাম, 'গৌণী'। উহা পরিপক্ক হইয়া পরাভক্তিতে পরিণত হইলে আর এরূপ ভয়ানক গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কা থাকে না। এই পরাভক্তির প্রভাবে সাধক প্রেমস্বরূপ ভগবানের এত নিকটতা লাভ করেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি ঘৃণার ভাব বিস্তার করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন না।

এই জীবনেই যে আমরা সকলে সামঞ্জস্যের সহিত চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারিব, তাহা সম্ভব নয়; তবে আমরা জানি—যে-চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ

সমন্বিত হইয়াছে, সেই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা মহৎ। উড়িবার জন্য পাখির তিনটি জিনিসের আবশ্যক—দুইটি পক্ষ ও চালাইবার হালস্বরূপ একটি পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যোগ উহার পুচ্ছ। যাঁহারা এই তিনপ্রকার সাধন-প্রণালী একসঙ্গে সামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ভক্তিকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটি সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইলেও ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের অবস্থায় আগাইয়া দেওয়া ব্যতীত এগুলির আর কোন উপযোগিতা নাই।

জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের আচার্যগণের মধ্যে সামান্য একটু মতভেদ আছে, যদিও উভয়ে ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তির উপায়মাত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, কিন্তু ভক্তেরা উহাকে উপায় ও উদ্দেশ্য—একাধারে দুই-ই মনে করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, এ প্রভেদ নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভক্তিকে সাধন-স্বরূপ ধরিলে নিম্নস্তরের উপাসনামাত্র বুঝায়, আর একটু অগ্রসর হইলে এই নিম্নস্তরের উপাসনাই উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত অভিন্নভাব ধারণ করে। প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ সাধন-প্রণালীর উপর ঝোঁক দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান—প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও পূর্ণভক্তির সহিত আসিবেই আসিবে, আর পূর্ণজ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভিন্ন।

এইটি মনে রাখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক—এ বিষয়ে বেদান্তের মহান ভাষ্যকারেরা কি বলেন। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'—এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভগবান শঙ্কর বলেন, লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে—অমুক গুরুর ভক্ত, অমুক রাজার ভক্ত। যে গুরু বা রাজার নির্দেশানুবর্তী হয় এবং সেই নির্দেশানুবর্তনকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করে, তাহাকেই ভক্ত বলিয়া থাকে। লোকে আরও এইরূপ বলিয়া থাকে—পতিপ্রাণা স্ত্রী বিদেশগত পতির ধ্যান করিতেছে। এখানেও একরূপ সাগ্রহ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিই লক্ষিত হইয়াছে।'[১] শঙ্করের মতে ইহাই ভক্তি।

আবার ভগবান রামানুজ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ

---

১ তথা হি লোকে গুরুমুপাস্তে রাজানমুপাস্ত ইতি চ যস্তাৎপর্যেণ গুর্বাদীননুবর্ততে স এবমুচ্যতে। তথা ধ্যায়তি প্রোষিতনাথা পতিমিতি যা নিরন্তরস্মরণা পতিং প্রতি সোৎকণ্ঠা-সৈবমভিধীয়তে।—শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১

'এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। যখন ভগবৎ-সম্বন্ধে এইরূপ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির অবস্থা লব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়।' এইরূপে শাস্ত্র এই নিরন্তর স্মরণকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। এইরূপ স্মরণ আবার দর্শন করারই সামিল। কারণ 'সেই পর ও অবর (দূর ও সন্নিহিত) পুরুষকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি নাশ হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং কর্মক্ষয় হইয়া যায়।'—এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যে 'স্মরণ' দর্শনের সহিত সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে; যিনি সন্নিহিত, তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু যিনি দূরবর্তী, তাঁহাকে কেবল স্মরণ করা যাইতে পারে; তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সন্নিহিত ও দূরস্থ উভয়কেই দর্শন করিতে বলিতেছেন; সুতরাং ঐরূপ স্মরণ ও দর্শন এক পর্যায়ের কার্য বলিয়া সূচিত হইল। এই স্মৃতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুল্য হইয়া পড়ে।....আর উপাসনা অর্থে সর্বদা স্মরণ, ইহা শাস্ত্রের প্রধান প্রধান শ্লোক হইতে দৃষ্ট হয়। জ্ঞান—যাহা নিরন্তর উপাসনার সহিত অভেদ, তাহাও নিরন্তর স্মরণ-অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।...সুতরাং স্মৃতি যখন প্রত্যক্ষানুভূতির আকার ধারণ করে, তাহাই শাস্ত্রে মুক্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'নানাবিধ বিদ্যা দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, কিংবা বহু বেদাধ্যয়নের দ্বারা আত্মা লভ্য নন। যাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, তিনিই সেই আত্মাকে লাভ করেন, তাঁহার নিকটে আত্মা আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।" এ-স্থলে প্রথমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মা লব্ধ হন না বলিয়া পরে বলিতেছেন, "আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই আত্মা লব্ধ হন"; অত্যন্ত প্রিয়কেই 'বরণ' করা সম্ভব। যিনি আত্মাকে অতিশয় ভালবাসেন, আত্মা তাঁহাকেই অতিশয় ভালবাসেন, এই প্রিয় ব্যক্তি যাহাতে আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে সাহায্য করেন। কারণ ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, "যাহারা নিরন্তর আমাতে আসক্ত এবং প্রেমের সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে চালিত করি, যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ করে।"[১]অতএব কথিত হইয়াছে যে,

১ ধ্যানং তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নস্মৃতিসংতানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ। "স্মৃত্যুপলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি ধ্রুবায়াঃ স্মৃতেরপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। সা চ স্মৃতির্দর্শনসমানাকারা; "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ এবং চ সতি 'আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যনেন নিদিধ্যাসনস্য দর্শনরূপতা বিধীয়তে। ভবতি চ

প্রত্যক্ষ-অনুভবাত্মক এই স্মৃতি যাঁহার অতি প্রিয় (উহা ঐ স্মৃতির বিষয়ীভূত পুরুষের অতি প্রিয় বলিয়া) তাঁহাকেই সেই পরমাত্মা বরণ করেন, তাঁহার দ্বারাই সেই পরমাত্মা লব্ধ হন। এই নিরন্তর স্মরণ 'ভক্তি' শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

পতঞ্জলির 'ঈশ্বরপ্রাণিধানাদ্বা' সূত্রটির ব্যাখ্যায় ভোজ বলেন—"প্রণিধান-অর্থে সেইরূপ ভক্তি, যাহাতে সমুদয় ফলাকাঙ্ক্ষা (যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগাদি) ত্যক্ত হইয়া সমুদয় কর্ম সেই পরম গুরুর উপর সমর্পিত হয়।"[১] আবার ভগবান ব্যাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন, "প্রণিধান-অর্থে ভক্তিবিশেষ, যদ্দ্বারা যোগীর নিকট সেই পরম পুরুষের কৃপার আবির্ভাব হয় এবং তাঁহার বাসনাসকল পূর্ণ হয়।"[২] শাণ্ডিল্যের মতে "ঈশ্বরে পরমানুরক্তিই ভক্তি।"[৩] ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্মৃতের্ভাবন-প্রকর্ষাদ্দর্শনরূপতা। বাক্যকারেণৈতৎ সর্বং প্রপঞ্চিতম্। 'বেদনমুপাসনম্ স্যাৎ তদ্বিষয়ে শ্রবণাদিতি।' সর্বাসূপনিষৎসু মোক্ষসাধনতয়া বিহিতং 'বেদনমুপাসনম্' ইত্যুক্তং 'সকৃৎপ্রত্যয়ং কুর্যাচ্ছব্দার্থস্য কৃতত্বাৎ প্রযাজাদিবৎ' ইতি পূর্বপক্ষং কৃত্বা 'সিদ্ধং তুপাসনশব্দাৎ' ইতি বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষসাধনমিতি নির্ণীতম্। 'উপাসনং স্যাদ্ ধ্রুবানুস্মৃতির্দর্শনান্নির্বচনাচ্চেতি' তস্যৈব বেদনস্যোপাসনরূপস্যাসকৃদাবৃত্তস্য ধ্রুবানুস্মৃতিত্বমুপবর্ণিতম্। সেয়ং স্মৃতিদর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ। এবং প্রত্যক্ষতাপন্নামপবর্গসাধনভূতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' ইতি অনেন কেবলশ্রবণমননিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যনুপায়তামুক্ত্বা 'যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈব লভ্যঃ' ইত্যুক্তম্। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তং—'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে' ইতি 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ইতি চ। অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্যমাণাত্যর্থপ্রিয়ত্বেন স্বয়মপ্যত্যর্থপ্রিয়া যস্য চ এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মেত্যুক্তং ভবতি, এবংরূপা ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। —রামানুজভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১

১ প্রণিধানং তত্র ভক্তিবিশেষো বিশিষ্টমুপাসনং সর্বক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং। বিষয়সুখাদিকং ফলমনিচ্ছন্ সর্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ পরমগুরাবর্পয়তি। —ভোজবৃত্তি, পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।২৩

২ 'প্রণিধানাদ্ভক্তিবিশেষাদাবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাত্যভিধ্যানমাত্রেণ' ইত্যাদি। —ব্যাসভাষ্য, ১। ঐ, ঐ

৩ 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'—শাণ্ডিল্যসূত্র, ১।২

'অজ্ঞলোকের ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যেরূপ তীব্র আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমাকে স্মরণ করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়।'[১] আসক্তি—কাহার জন্য? পরম প্রভু ঈশ্বরের জন্য। আর কাহাকেও ভালবাসা—তা তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহাকে ভালবাসা কখনই 'ভক্তি' হইতে পারে না। ইহার প্রমাণস্বরূপ রামানুজ শ্রীভাষ্যে এক প্রাচীন আচার্যের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—'ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত জগদন্তর্গত সকল প্রাণী কর্মহেতু জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত; তাহারা অবিদ্যার অন্তর্গত ও পরিবর্তনশীল বলিয়া সাধকের ধ্যানের সহায় নয়।'[২] শাণ্ডিল্যসূত্রের 'অনুরক্তি' শব্দ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ব্যাখ্যাকার স্বপ্নেশ্বর বলেন, 'উহার অর্থঃ অনু—পশ্চাৎ, ও ভক্তি—আসক্তি অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ ও মহিমাজ্ঞানের পর তাঁহার প্রতি যে আসক্তি আসে।'[৩] তাহা না হইলে যে-কোন ব্যক্তির প্রতি, যেমন স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি অন্ধ আসক্তিও ভক্তি হইয়া যায়। অতএব আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সাধারণ পূজাপাঠাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য চেষ্টা-পরম্পরার নাম ভক্তি।

ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বর কে? 'যাঁহা দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে'[৪] তিনি ঈশ্বর—'অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, পরমকারুণিক, গুরুর গুরু।'[৫] আর সকলের উপর 'তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।'[৬]

---

১ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু।। — বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।১৯

২ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তা জগদন্তর্ব্যবস্থিতাঃ।
প্রাণিনঃ কর্মজনিতসংসারবশবর্তিনঃ।।
যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামুপকারকাঃ।
অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্বে তে হি সংসারগোচরাঃ।।

৩ ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু—পশ্চাজ্জায়মানত্বাদনুরক্তিরিত্যুক্তম্।
—স্বপ্নেশ্বরটীকা, শাণ্ডিল্যসূত্র, ১।২

৪ জন্মাদ্যস্য যতঃ। —ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২ ৫ পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।২৫-২৬

৬ স ঈশ্বরোঽনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ। — শাণ্ডিল্যসূত্র

এগুলি অবশ্য সগুণ ঈশ্বরের সংজ্ঞা। তবে কি ঈশ্বর দুইটি? 'নেতি নেতি' করিয়া জ্ঞানী যে সচ্চিদানন্দে উপনীত হন, তিনি একটি এবং ভক্তের প্রেমময় ভগবান আর একটি? না সেই একই সচ্চিদানন্দ—প্রেমময় ভগবান,একাধারে তিনি সগুণ ও নির্গুণ। সর্বদাই বুঝিতে হইবে, ভক্তের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক নন। সবই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম'। তবে নির্গুণ পরব্রহ্মের এই নির্গুণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া প্রেম বা উপাসনার পাত্র হইতে পারেন না। এজন্য ভক্ত ব্রহ্মের সগুণ ভাব অর্থাৎ পরমনিয়ন্তা ঈশ্বরকেই উপাস্যরূপে নির্বাচন করেন। একটি উপমার দ্বারা বুঝা যাক ঃ

ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বা উপাদান—তাহা হইতে অনেক বস্তু নির্মিত হইয়াছে। মৃত্তিকারূপে ঐগুলি এক বটে, কিন্তু রূপ বা প্রকাশ উহাদিগকে পৃথক করিয়াছে। উৎপত্তির পূর্বে তাহারা ঐ মৃত্তিকাতেই অব্যক্তভাবে ছিল। উপাদান হিসাবে এক, কিন্তু যখন বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, যতদিন তাহাদের সেই সেই রূপ থাকে, ততদিন সেগুলি পৃথক পৃথক। মাটির ইঁদুর কোনদিন মাটির হাতি হইতে পারে না। কারণ আকার গ্রহণ করিলে বিশেষ আকৃতিই বস্তুর বিশেষত্বের জ্ঞাপক। বিশেষ কোন আকৃতি-হীন মৃত্তিকা হিসাবে অবশ্য উহারা একই। ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্য-স্বরূপের উচ্চতম অভিব্যক্তি অথবা মনুষ্যমনের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি।

বেদান্তসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তাত্মা যে প্রায় অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানের অধিকারী হন, তাহা বর্ণন করিয়া ব্যাস আর একটি সূত্রে বলিতেছেন, "কিন্তু কেহই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিলাভ করিবে না, তাহা কেবল ঈশ্বরের।"[১] এই সূত্রব্যাখ্যার সময় দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ পরতন্ত্র জীবের পক্ষে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করা যে কোনকালে সম্ভব নয়, তাহা অনায়াসে দেখাইতে পারেন। পূর্ণ দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার মধ্বাচার্য বরাহপুরাণ হইতে একটি শ্লোক তুলিয়া তাঁহার প্রিয় সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই সূত্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্যকার রামানুজ বলেন ঃ "সংশয় উপস্থিত হয় যে, মুক্তাত্মাদিগের শক্তির মধ্যে পরম পুরুষের অসাধারণ

১ জগদ্ব্যাপারবর্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ। —ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

শক্তি অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-শক্তি ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব অন্তর্ভুক্ত কিনা? অথবা উহার অভাবে পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনই কেবল তাঁহাদের ঐশ্বর্য কিনা? মুক্তাত্মা জগতের নিয়ন্তৃত্ব লাভ করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করা যাক। কেন? কারণ শ্রুতি বলেন, 'মুক্তাত্মা পরম একত্ব লাভ করেন' (মুণ্ডক উপনিষদ্ ৩।১।৩)। আরও উক্ত হইয়াছে, 'তাঁহার সমুদয় বাসনা পূর্ণ হয়'। এখন কথা এই, পরম একত্ব ও সকল বাসনার পরিপূরণ পরম পুরুষের অসাধারণ শক্তি—জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব সকল বাসনার পরিপূরণ ও পরম একত্ব লাভ হয় বলিলেই মানিতে হইবে, মুক্তাত্মা সমগ্র জগতের নিয়ন্তৃত্বও লাভ করেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি, মুক্তাত্মা কেবল জগন্নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত আর সমুদয় শক্তিলাভ করেন। 'জগন্নিয়মন' অর্থে জগতের সমুদয় স্থাবর জঙ্গমের বিভিন্ন প্রকার রূপ, স্থিতি ও বাসনার নিয়ন্তৃত্ব। মুক্তাত্মাদিগের কিন্তু এই জগন্নিয়মন-শক্তি নাই, যাহা কিছু ঈশ্বরের স্বরূপ আবৃত করে, তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে সে-সকল আবরণ চলিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাদের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতি হয়—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। ইহা কিরূপে জানিলে? নিখিল-জগন্নিয়ন্তৃত্ব কেবল পরব্রহ্মেরই গুণ বলিয়া যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রবাক্যবলেই ইহা জানিয়াছি। 'যাঁহা হইতে সমুদয় বস্তু জন্মায়, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যাঁহাতে প্রলয়কালে প্রবেশ করে, তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।'—(তৈত্তি· উপ· ৩।১)। যদি এই জগন্নিয়ন্তৃত্ব মুক্তাত্মাদেরও সাধারণ গুণ হয়, তবে উদ্ধৃত শ্লোক ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে না, কারণ তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব-গুণের দ্বারা তাঁহার লক্ষণ করা হইয়াছে। অসাধারণ গুণগুলিকেই বিশেষ লক্ষণ বলা হয়। অতএব নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যসমূহে পরমপুরুষকেই জগন্নিয়মনের কর্তারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আর ঐ ঐ স্থলে মুক্তাত্মার এমন বর্ণনা নাই, যাহাতে জগন্নিয়ন্তৃত্ব তাঁহাদের উপর আরোপিত হইতে পারে। বেদবাক্যগুলি এই: 'বৎস, আদিতে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন আমি বহু সৃষ্টি করিব। তিনি তেজ সৃজন করিলেন। কেবল ব্রহ্মাই আদিতে ছিলেন। তিনি পরিণত হইলেন। তিনি ক্ষত্র নামে এক সুন্দররূপ সৃজন করিলেন। বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এই-সকল দেবতাই ক্ষত্র।' 'আদিতে আত্মাই ছিলেন। ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব—পরে তিনি এই জগৎ সৃজন করিলেন।' 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। ব্রহ্মা, ঈশান, দ্যাবা-পৃথিবী, তারা, জল, অগ্নি, সোম কিংবা সূর্য—কিছুই ছিল না, তিনি একাকী সুখী হইলেন না।

ধ্যানের পর তাঁহার একটি কন্যা ও দশ ইন্দ্রিয় জন্মিল।' 'যিনি পৃথিবীতে বাস করিয়া পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র', যিনি আত্মাতে বাস করিয়া' ইত্যাদি।[১]

পরসূত্র-ব্যাখ্যায় রামানুজ বলিতেছেন, 'যদি বল—ইহা সত্য নয়, কারণ বেদে ইহার বিপরীতার্থপ্রতিপাদক অনেক শ্লোক আছে, তাহা হইলে বলিব—তাহা নিম্নদেবলোকে মুক্তাত্মার ঐশ্বর্যবর্ণনা মাত্র।'[২] ইহাও একরূপ সহজ মীমাংসা হইল। যদিও রামানুজের মতে সমষ্টির ঐক্য স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার মতে এই সমষ্টির মধ্যে নিত্য ভেদসমূহ আছে। অতএব এই মতও কার্যতঃ দ্বৈত বলিয়া জীবাত্মা ও সগুণ ঈশ্বরের স্পষ্ট ভেদ রক্ষা করা রামানুজের পক্ষে সহজ হইয়াছে।

এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, অদ্বৈতমতের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই বিষয়ে কি বলেন। আমরা দেখিব, অদ্বৈতমত কেমন দ্বৈতবাদীর সকল আশা আকাঙ্ক্ষা

---

১ কিং মুক্তস্যৈশ্বর্যং জগৎসৃষ্ট্যাদি পরমপুরুষসাধারণং সর্বেশ্বরত্বমপি উত তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতিসংশয়ঃ, কিং যুক্তং, জগদীশ্বরত্বমপীতি, কুতঃ, নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ, সত্যসঙ্কল্পত্বশ্রুতেশ্চ, নহি পরমসাম্যসত্যসঙ্কল্পত্বং সর্বেশ্বরাসাধারণজগদ্ব্যাপাররূপজগন্নিয়মনেন বিনোপপদ্যতে অতঃ সত্যসঙ্কল্পতাপরমসাম্যোপপত্তয়ে সমস্তজগন্নিয়মনরূপমপি মুক্তৈশ্বর্যমিত্যেবং প্রাপ্তেঃ, প্রচক্ষ্মহে, জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি, জগদ্ব্যাপারো নিখিলচেতনাচেতনস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদনিয়মনন্তদ্বর্জং নিরস্তনিখিলতিরোধানস্য নির্ব্যাজব্রহ্মানুভবরূপং মুক্তস্যৈশ্বর্যং, কুতঃ, প্রকরণাৎ নিখিলজগন্নিয়মনং হি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্যাম্নায়তে, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি', যদ্যেতন্নিখিলজগন্নিয়মনং মুক্তানামপি সাধারণং স্যাৎ, ততশ্চেদং জগদীশ্বরত্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণং ন সঙ্গচ্ছতে। অসাধারণস্য হি লক্ষণত্বং তথা 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজতেতি' 'ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীত্তদেকং সন্নব্যভবৎ, তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান' ইতি 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি স ইমাল্লোঁকানসৃজত' ইতি। 'একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি নাপো নাগ্নির্ন, সোমো ন সূর্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তস্থস্যৈকা কন্যা দশেন্দ্রিয়াণি' ইত্যাদিষু 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তর' ইত্যারভ্য 'য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইত্যাদিষু চ নিখিলজগন্নিয়মনং পরমপুরুষং প্রকৃত্যৈব শ্রূয়তে' অসন্নিহিতত্বাচ্চ, ন চৈতেষু নিখিলজগন্নিয়মনপ্রসঙ্গেষু মুক্তস্য সন্নিধানমস্তি যেন জগদ্ব্যাপারস্তস্যাপি স্যাৎ।— রামানুজভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

২ 'প্রত্যক্ষোপদেশান্নেতিচেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।' এই সূত্রের (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৮) রামানুজভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির মহোচ্চ দিব্যভাবের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। যাঁহারা মুক্তিলাভের পরও নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবান হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চান, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার ও সগুণ ব্রহ্মকে সম্ভোগ করিবার যথেষ্ট অবসর থাকিবে। ইঁহাদেরই কথা ভাগবত-পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেঃ 'হে রাজন্, হরির এতাদৃশ গুণরাশি যে, যে-সকল মুনি আত্মারাম, যাঁহাদের সকল বন্ধন চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারাও ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।'[১]

সাংখ্যেরা ইঁহাদিগকেই 'প্রকৃতিলীন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া ইঁহারা পরকল্পে কতকগুলি জগতের শাসনকর্তারূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ কখনই ঈশ্বরতুল্য হইতে পারেন না। যাঁহারা এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে সৃষ্টি সৃষ্ট বা স্রষ্টা নাই, যেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জ্ঞান নাই, যেখানে আমি তুমি বা তিনি নাই, যেখানে প্রমাতা প্রমেয় বা প্রমাণ নাই, 'সেখানে কে কাহাকে দেখে?'— এরূপ ব্যক্তি সবকিছুর বাহিরে গিয়াছেন, 'যেখানে বাক্য অথবা মনও যাইতে পারে না।' এরূপ ব্যক্তি এমন স্থানে গিয়াছেন, যাহাকে শ্রুতি, 'নেতি, নেতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না বা এরূপ অবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মকে প্রকৃতি, আত্মা এবং ঐ উভয়ের অন্তর্যামী ঈশ্বর—এই তিনরূপে বিভক্ত দেখিবেন। ভক্তির আতিশয্যে চেতনার উর্ধ্বতর স্তরে যখন প্রহ্লাদ নিজেকে ভুলিয়া গেলেন, তখন তিনি জগৎ ও তাহার কারণ—কিছুই তো দেখিতে পাইলেন না, সমুদয়ই তাঁহার নিকট নামরূপ দ্বারা বিভক্ত নয়—এমন এক অনন্তরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু যখনই তাঁহার বোধ হইল—তিনি প্রহ্লাদ, অমনি তাঁহার নিকট জগৎ ও অশেষকল্যাণগুণরাশির আধারস্বরূপ জগদীশ্বর প্রকাশিত হইলেন। মহাভাগা গোপীদেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। যতক্ষণ তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগে ও প্রেমে অহংজ্ঞানশূন্য ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা কৃষ্ণকে আবার উপাস্যরূপে পৃথকভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা আবার গোপীভাব প্রাপ্ত হইলেন। তখনই তাঁহাদের সম্মুখে মুখকমলে মৃদুহাস্যযুত, পীতাম্বরধারী,

---

১ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৭।১০

মালাভূষিত ও সাক্ষাৎ মন্মথের মন-মথনকারী কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন।'[১]

এখন আবার আমরা আমাদের আচার্য শঙ্করের কথায় আসিতেছি। শঙ্কর বলেনঃ যাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পরমেশ্বরের সহিত মিলিত হন, অথচ যাঁহাদের মন লয় হয় না, অক্ষুণ্ণ থাকে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য সসীম কি অসীম? এই সংশয় উপস্থিত হইলে যুক্তি দেখানো হয় যে, তাঁহাদের ঐশ্বর্য অসীম, কারণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় 'তিনি স্বরাজ্য লাভ করেন', 'সকল দেবতা তাঁহার পূজা করেন', 'সমগ্র জগতে তাঁহার কামনার পূর্তি হয়'। ইহার উত্তরে ব্যাসের উক্তি 'জগদ্‌ব্যাপারবর্জং'; মুক্তাত্মাগণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যতীত অন্যান্য অণিমাদি শক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তৃত্ব কেবল নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের—কারণ সৃষ্টিসম্বন্ধে যত শাস্ত্রীয় উক্তি আছে, সবগুলিতে তাঁহারই কথা বলা হইয়াছে; কোন প্রসঙ্গে সেখানে মুক্তাত্মাদের কোন উল্লেখ নাই। সেই পরমপুরুষ একাই জগন্নিয়ন্তৃত্বে নিযুক্ত। সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে যত শ্রুতি আছে, সবই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। আর তাঁহার প্রসঙ্গে 'নিত্যসিদ্ধ' এই বিশেষণও প্রদত্ত হইয়াছে। শাস্ত্র আরও বলেন, মুক্তাত্মাদের অণিমাদিশক্তি ঈশ্বরের উপাসনা ও অন্বেষণ হইতেই লব্ধ হয়। অতএব সেই শক্তিগুলি অসীম নয়—সেগুলির আদি আছে ও সেগুলি সীমাবদ্ধ, সুতরাং জগতের নিয়ন্তৃত্ব-বিষয়ে মুক্তাত্মাদের কোন স্থান নাই। আবার তাঁহাদের নিজ নিজ মনের অস্তিত্ববশতঃ এরূপ সম্ভব যে, পরস্পরের ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে; একজন হয়তো সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন, আর একজন নাশ ইচ্ছা করিলেন। এই বিরোধ এড়াইবার একমাত্র উপায়—সমুদয় ইচ্ছা এক ইচ্ছার অধীন করা। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, মুক্ত পুরুষগণের ইচ্ছা সেই 'পরম পুরুষের অধীন'।[২]

অতএব সগুণ ব্রহ্মেরই প্রতি ভক্তি-প্রয়োগ সম্ভব। 'যাহারা অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক তাহাদের ক্লেশ অধিকতর।'[১] ভক্তি মানবপ্রকৃতির অনুকূলে সহজভাবে প্রবাহিত। আমরা ব্রহ্মের মানবীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব

১ তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥— শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩২।২

২ যে সগুণব্রহ্মোপাসনাৎ সহৈব মনসেশ্বরসাযুজ্যং ব্রজন্তি কিন্তেষাং নিরবগ্রহমৈশ্বর্যং ভবত্যাহোস্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? নিরঙ্কুশমেবৈষামৈশ্বর্যং ভবিতুমর্হতি 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্' 'সর্বেহস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি' 'তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিভ্য ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি—জগদ্ব্যাপারবর্জমিতি। জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং

১ গীতা, ১২।৫

ধারণা করিতে পারি না—ইহা সত্য কথা। কিন্তু আমাদের জ্ঞাত আর সকল বস্তুর সম্বন্ধেও কি ইহা সমভাবে সত্য নয়? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানবিৎ ভগবান কপিল বহুযুগ পূর্বে প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন যে, আমাদের বাহ্য বা আন্তর সর্বপ্রকার বিষয়জ্ঞান বা ধারণার মধ্যে মানবীয় চেতনা বা বুদ্ধি অন্যতম উপাদান। শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর পর্যন্ত বিচার করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের অনুভূত সমুদয় বস্তুই বুদ্ধি ও তাহার সহিত অপর কোন বস্তুর মিশ্রণ, তা সেটি যাহাই হউক। আর যাহাকে আমরা সচরাচর 'সত্য বস্তু' বলিয়া মনে করি, তাহা এই অনিবার্য মিশ্রণ। বাস্তবিকই বর্তমানে বা ভবিষ্যতে মানবমনের পক্ষে সত্যের জ্ঞান যতদূর সম্ভব, তাহা ইহার অতিরিক্ত আর কিছু নয়। অতএব ঈশ্বর মানবধর্মী বলিয়া তাঁহাকে অসত্য বলা নিছক বাজে কথা। এ যেন পাশ্চাত্য দর্শনে বিজ্ঞানবাদ (Idealism) ও বাস্তববাদের (Realism) মধ্যে তুচ্ছ বিবাদের মতো। ঐ বিবাদ আপাততঃ ভয়াবহ বোধ হইলেও বাস্তব (real) শব্দের অর্থ লইয়া মারপ্যাঁচের উপর স্থাপিত। 'সত্য' শব্দের দ্বারা যত প্রকার ভাব সূচিত হইয়াছে, সে-সব ভাবই 'ঈশ্বর' ভাবটির অন্তর্গত। জগতের অন্যান্য বস্তু যতদূর সত্য, ঈশ্বরও ততদূর সত্য। আর বাস্তব-শব্দটি এখানে যে অর্থে প্রযুক্ত হইল, ঐ শব্দদ্বারা তদপেক্ষা অধিক আর কিছু বুঝায় না। ইহাই হিন্দুদর্শনে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা।

প্রত্যক্ষানুভূতিই 'ধর্ম'

ভক্তের পক্ষে এই সকল শুষ্ক বিষয় জানার প্রয়োজন—কেবল নিজ ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করার জন্য। এতদ্ব্যতীত উহাদের আর কোন উপযোগিতা নাই, কারণ তিনি এমন এক পথে চলিয়াছেন, যাহা শীঘ্রই তাঁহাকে যুক্তির অস্পষ্ট ও

বর্জয়িত্বাহন্যদণিমাদ্যাত্মকমৈশ্বর্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি, জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যেবেশ্বরস্য। কুতঃ? তস্য তত্র প্রকৃতত্বাদসন্নিহিতত্বাচ্চেতরেষাম্। পর এব হীশ্বরো জগদ্ব্যাপারেঽধিকৃতঃ তমেব প্রকৃত্যোৎপত্ত্যাদ্যুপদেশান্নিত্যশব্দনিবন্ধনত্বাচ্চ। তদন্বেষণবিজিজ্ঞাসনপূর্বকমিতরেষা-মাদিমদৈশ্বর্যং শ্রূয়তে। তেনাসন্নিহিতাস্তে জগদ্ব্যাপারে। সমনস্কত্বাদেব চৈষামনৈকমত্যে কস্যচিৎ স্থিত্যভিপ্রায়ঃ, কস্যচিৎ সংহারাভিপ্রায় ইত্যেবং বিরোধোঽপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সঙ্কল্পমন্বন্যস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধঃ সমর্থ্যেত, ততঃ পরমেশ্বরাকূততন্ত্রত্বমেবেতরেষামিতি ব্যবতিষ্ঠন্তে।—শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১৭

চিত্তচঞ্চলকারী রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষানুভূতির রাজ্যে লইয়া যাইবে; তিনি শীঘ্রই ঈশ্বরকৃপায় এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণের শুষ্ক যুক্তি অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, আর বুদ্ধির সাহায্যে অন্ধকারে বৃথান্বেষণের পরিবর্তে প্রত্যক্ষানুভূতির উজ্জ্বল দিবালোক প্রকাশিত হয়। তিনি তখন বিচার বা বিশ্বাস কিছুই করেন না, তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করেন। তিনি আর তর্ক করেন না, উপলব্ধি করেন। আর এই ভগবানকে দেখা, তাঁহাকে উপলব্ধি করা ও তাঁহাকে সম্ভোগ করা কি তর্কবিচার হইতে উচ্চতর নয়? শুধু তাই নয়, অনেক ভক্ত আছেন, যাঁহারা ভক্তিকে মুক্তি হইতেও বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহা কি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ প্রয়োজনও নয়? এমন লোক জগতে আছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক, যাঁহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা কিছু মানুষকে শারীরিক সুখ দিতে পারে—তাহারই বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে; ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, আত্মা এবং এইরূপ অন্যান্য বিষয়গুলি কোন কাজের নয়, কারণ এগুলির দ্বারা টাকাকড়ি বা দৈহিক সুখ পাওয়া যায় না। এরূপ লোকের মতে যে-সকল পদার্থে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হয়, সেগুলির কোন প্রয়োজন নাই। যাহার যে-বিষয়ে যেমন অভাববোধ, তাহার প্রয়োজনবোধও সেই বিষয়ে তদনুরূপ। সুতরাং যাহারা পান, ভোজন, অপত্য-উৎপাদন ও তারপর মৃত্যু—ইহার উপর আর উঠিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে লাভ-বোধ কেবল ইন্দ্রিয়ের সুখে। তাহাদের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয়ের জন্য সামান্য ব্যাকুলতা জন্মিতেও অনেক জন্ম লাগিবে। কিন্তু যাঁহাদের নিকট আত্মার উন্নতি-সাধন ঐহিক জীবনের ক্ষণিক সুখ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বোধ হয়, যাঁহাদের চক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কেবল অবোধ শিশুর ক্রীড়ার মতো মনে হয়, তাঁহাদের নিকট ভগবান ও ভগবৎ-প্রেমই মানবজীবনের সর্বোচ্চ ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই ঘোর ভোগলিপ্সাপূর্ণ জগতে এইরূপ মানুষ এখনো কয়েকজন জীবিত আছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তি পরা ও গৌণী—এই দুই ভাগে বিভক্ত; 'গৌণী' অর্থাৎ সাধনভক্তি, 'পরাভক্তি' উহারই পূর্ণ বা চরম অবস্থা। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, এই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধনাবস্থায় কতকগুলি বাহ্য সহায় না লইলে চলে না। বাস্তবিক সকল ধর্মের পৌরাণিক ও রূপক ভাগই প্রথমাবস্থায় উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। আরও ইহাও

একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—যাহাদের ধর্মপ্রণালী পৌরাণিকভাববহুল ও অনুষ্ঠানপ্রচুর, সেই সকল সম্প্রদায়েই বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছিলেন। যাহা কিছু কবিত্বময়, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মহান, যাহা কিছু ভগবৎপথে স্খলিতচরণে অগ্রসর সুকুমার মনের দৃঢ় অবলম্বনস্বরূপ, সেই ভাবগুলিকে যে-সকল শুষ্ক গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মপ্রণালী একেবারে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে চায়—যে-সকল ধর্মপ্রণালী আধ্যাত্মিক হর্ম্যের ছাদের অবলম্বন স্তম্ভগুলিকে পর্যন্ত ভাঙিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে এবং সত্যসম্বন্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণ ধারণা লইয়া যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু মানবহৃদয়ে ক্রমবর্ধমান আধ্যাত্মিক জীবনরূপ চারাগাছটির গঠনোপযোগী উপাদান, সেগুলি পর্যন্ত দূর করিয়া দিতে চায়, দেখিতে পাওয়া যায়—সেই-সকল ধর্ম শীঘ্রই শূন্য একটি আধারে, শব্দরাশি ও তর্কাভাসের একটি কাঠামোতে পর্যবসিত হইয়াছে। হয়তো একটু সামাজিক আবর্জনা-দূরীকরণ বা তথাকথিত সংস্কার-প্রিয়তার আভাসযুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

যাহাদের ধর্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জড়বাদী; তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ; উহাই তাহাদের মতে মানবজীবনের সর্বস্ব। মানুষের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অভিপ্রেত রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কার্যই[1] ইহাদের মতে মানবজীবনের সর্বস্ব। এই অজ্ঞান ও গোঁড়ামির অদ্ভুত মিশ্রণের অনুগামিগণ যত শীঘ্র তাহাদের স্বরূপ প্রকটিত করিয়া বাহির হয় এবং নাস্তিক জড়বাদীদের দলে যোগ দেয়—ইহাই তাহাদের করা উচিত—ততই সংসারের মঙ্গল। একবিন্দু ধর্মানুষ্ঠান ও অপরোক্ষানুভূতি রাশি রাশি বাক্‌প্রপঞ্চ ও মূর্খ-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞান ও গোঁড়ামির এই শুষ্ক ধূলিময় ক্ষেত্রে একজন—মাত্র একজন অমিততেজা ধর্মবীর জন্মিয়াছেন দেখাও তো! না পার, চুপ করিয়া থাক, হৃদয়ের দরজা-জানালা খুলিয়া দাও, সত্যের বিমল আলোক প্রবেশ করুক, তত্ত্বদর্শী সেই ভারতীয় সাধুগণের পদতলে বালকের ন্যায় বসিয়া শোন, তাঁহারা কি বলিতেছেন।

১ ইষ্টাপূর্ত

গুরুর প্রয়োজনীয়তা

জীবাত্মামাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই করিবে—শেষ পর্যন্ত সকলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে। আমরা এখন যাহা হইয়াছি, তাহা আমাদের অতীত কার্য ও চিন্তারাশির ফলস্বরূপ। আর ভবিষ্যতে যাহা হইব, তাহা বর্তমানে যেরূপ চিন্তা ও কার্য করিতেছি, তাহার ফলস্বরূপ হইবে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া যে বাহির হইতে আমাদের কোন সহায়তার আবশ্যক নাই, তাহা নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন। যখন এই সহায়তা পাওয়া যায়, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে, উহার উন্নতি ত্বরান্বিত হয়, সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব ও সিদ্ধ হইয়া যায়।

এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। একটি আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে এই শক্তি লাভ করিতে পারে, আর কিছু হইতেই নয়। আমরা সারা জীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব বুদ্ধিমান হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব—আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। গ্রন্থপাঠ করিতে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ ভাবি, আমাদের আধ্যাত্মিক উপকার হইতেছে। কিন্তু গ্রন্থপাঠে আমাদের কি ফল হইয়াছে, তাহা যদি ধীরভাবে বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিব বড়জোর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইয়াছে, অন্তরাত্মার কিছুই হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই আধ্যাত্মিক বাক্যবিন্যাসে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও কার্যকালে—প্রকৃত ধর্মভাবে জীবন-যাপন করিবার সময়—কেন এত ভয়াবহ ত্রুটিবিচ্যুতি লক্ষিত হয়, তাহার কারণ—আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে গ্রন্থরাশি পর্যাপ্ত নয়। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক।

যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'শিষ্য' বলে। এইরূপ

শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাঁহার এই সঞ্চার করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক; আর যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সতেজ হওয়া আবশ্যক, ভূমিও ভালভাবে কর্ষিত থাকা প্রয়োজন। যেখানে এই দুইটি বিদ্যমান, সেইখানেই প্রকৃত ধর্মের অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। 'ধর্মের প্রকৃত বক্তা অবশ্যই আশ্চর্য পুরুষ হইবেন, শ্রোতাও সুনিপুণ হওয়া চাই।'[১] যখন উভয়েই আশ্চর্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, অন্যত্র নয়। ঐরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু এবং এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য—মুমুক্ষু সাধক। আর সকলে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের কেবল একটু কৌতূহল, একটু জানিবার ইচ্ছামাত্র হইয়াছে, কিন্তু তাহারা এখনো ধর্মচক্রবালের বহির্দেশে রহিয়াছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে, কারণ সময়ে ইহা হইতেই প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা জাগিতে পারে। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয় তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে—আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্মলাভের আগ্রহ প্রবল হয়, তখনই ধর্মশক্তি-সঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন। যখন গ্রহীতার ধর্মালোক আকর্ষণ করিবার শক্তি পূর্ণ ও প্রবল হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট আলোকশক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে।

তবে পথে কতকগুলি মহাবিঘ্ন আছে, যথা— ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। আমরা নিজেদের জীবনেই ইহা লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায়ঃ হয়তো কাহাকেও খুব ভালবাসিতাম, তাহার মৃত্যু হইল, আঘাত পাইলাম। মনে হইল, যাহা ধরিতেছি তাহাই হাত ফসকাইয়া চলিয়া যাইতেছে, আমাদের প্রয়োজন একটি দৃঢ়তর উচ্চতর আশ্রয়—আমাদিগকে অবশ্যই ধার্মিক হইতে হইবে। কয়েক দিনেই ঐ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল! আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা সকলেই এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা বলিয়া অনেক সময়েই ভুল করিতেছি। কিন্তু যতদিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসগুলিকে ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা মনে করিব, ততদিন ধর্মের জন্য যথার্থ স্থায়ী ব্যাকুলতা জন্মিবে না, আর ততদিন শক্তিসঞ্চারকারী পুরুষেরও সাক্ষাৎ পাইব না। এই কারণে যখনই আমাদের মনে হয়, সত্যলাভের জন্য

১ 'আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা' ইত্যাদি।—কঠ উপ· ১।৩।৭

আমাদের এ-সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে, তখনই ঐরূপ মনে করা অপেক্ষা নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ জন্মিয়াছে কিনা। এরূপ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখিব, আমরা সত্যগ্রহণের উপযুক্ত নই—আমাদের প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা জাগে নাই।

আবার শক্তিসঞ্চারক গুরুসম্বন্ধে আরও অনেক বিঘ্ন আছে। অনেকে আছে, যাহারা স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও অহঙ্কারে নিজেদের সর্বজ্ঞ মনে করে, শুধু তাই নয়, অপরকেও নিজ স্কন্ধে লইয়া যাইবে বলিয়া ঘোষণা করে। এইরূপে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়। 'অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, অতি নির্বুদ্ধি হইলেও নিজেদের মহাপণ্ডিত মনে করিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় প্রতিপদবিক্ষেপেই স্খলিতপদ হইয়া পরিভ্রমণ করে।'[১]

এইরূপ মানুষেই জগৎ পরিপূর্ণ। সকলেই গুরু হইতে চায়। ভিখারিও লক্ষ টাকা দান করিতে চায়। এইরূপ লোক যেমন সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হয়, এই গুরুগণও তেমনি।

গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ

তবে গুরু চিনিব কিরূপে? সূর্যকে প্রকাশ করিতে মশালের প্রয়োজন হয় না। সূর্যকে দেখিবার জন্য আর বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলে আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে সূর্য উঠিয়াছে; এইরূপে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লোকগুরুর আবির্ভাব হইলে আত্মা স্বভাবতই জানিতে পারেন যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্যালোক-সম্পাত আরম্ভ হইয়াছে। সত্য স্বতঃপ্রমাণ, উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই—উহা স্বপ্রকাশ ; সত্য আমাদের অন্তস্তলে প্রবেশ করে, উহার সমক্ষে সমগ্র জগৎ দাঁড়াইয়া বলে, 'ইহাই সত্য'। যে-সকল আচার্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত, তাঁহারা জগতের

---

১ অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ......

......অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ—মুণ্ডক উপ, ১।২।৮ ; কঠ উপ, ১।২।৫

মধ্যে সর্বোচ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ লোকই তাঁহাদিগকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে। কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প-জ্ঞানীর নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য লাভ করিতে পারি। তবে আমাদের এরূপ অন্তর্দৃষ্টি নাই যে, আমরা আমাদের গুরু বা আচার্যের সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিতে পারি; এই কারণে গুরুশিষ্য উভয়ের সম্বন্ধেই কতকগুলি পরীক্ষা আবশ্যক।

শিষ্যের এই গুণগুলি আবশ্যক—পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অশুদ্ধাত্মা পুরুষ কখনো প্রকৃত ধার্মিক হইতে পারে না। কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে কেহ কখনো ধার্মিক হইতে পারে না। আর জ্ঞানতৃষ্ণা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, আমরা যাহা চাই, তাহাই পাই—ইহা একটি সনাতন নিয়ম। যে বস্তু আমরা অন্তরের সহিত চাই, তাহা ছাড়া আমরা অন্য বস্তু লাভ করিতে পারি না। ধর্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিস; আমরা সচরাচর যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নয়। শুধু ধর্মকথা শুনিলে ও ধর্মপুস্তক পড়িলেই যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না যে, হৃদয়ে ধর্ম-পিপাসা প্রবল হইয়াছে। যতদিন না প্রাণে ব্যাকুলতা জাগরিত হয় এবং যতদিন না আমরা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিতে পারি, ততদিন সদাসর্বদা অভ্যাস ও আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম আবশ্যক। উহা দু-এক দিনের কর্ম নয়, কয়েক বৎসর বা দু-এক জন্মেরও কর্ম নয়; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিতে পারে। কাহারো পক্ষে অল্পকালের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি অনন্তকাল অপেক্ষা করিতে হয়, ধৈর্যের সহিত তাহার জন্যও প্রস্তুত থাকা চাই। যে শিষ্য এইরূপ অধ্যবসায়-সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

গুরু সম্বন্ধে এইটুকু দেখিতে হইবে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। জগতের সকলেই বেদ বাইবেল বা কোরান পাঠ করিতেছে, কিন্তু শাস্ত্রসমূহ শুধু শব্দ এবং ব্যাকরণ—ধর্মের কয়েকখানা শুষ্ক অস্থিমাত্র। যে গুরু শব্দ লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করেন ও মনকে কেবল শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারা চালিত হইতে দেন তিনি ভাব হারাইয়া ফেলেন। শাস্ত্রের মর্ম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধর্মাচার্য। শাস্ত্রের শব্দজাল যেন মহারণ্য, মানুষ নিজেকে উহার ভিতর হারাইয়া ফেলে, পথ খুঁজিয়া পায় না। 'শব্দজাল মহারণ্যসদৃশ, চিত্তের ভ্রমণের কারণ।'[১] 'শব্দযোজনা, সুন্দর ভাষায় বক্তৃতা ও শাস্ত্রমর্ম ব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন উপায়—পণ্ডিতদিগের বিচার ও

১ শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।—বিবেকচূড়ামণি, ৬০

আমোদের বিষয়মাত্র, উহা দ্বারা সিদ্ধি বা মুক্তিলাভের সহায়তা হয় না।'[১] যাহারা ধর্মব্যাখ্যার সময় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করে, তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের ইচ্ছা—লোকে তাহাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত করুক। জগতের প্রধান ধর্মাচার্যগণ কেহই এইভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোকের অর্থ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিতে কখনো চেষ্টা করেন নাই, শব্দার্থ ও ধাত্বর্থ লইয়া ক্রমাগত মারপ্যাঁচ করেন নাই। তাঁহারা শুধু জগৎকে শাস্ত্রের মহান ভাব শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাহাদের শিখাইবার কিছুই নাই, তাহারা হয়তো শাস্ত্র হইতে একটি শব্দ লইয়া তাহারই উপর তিনখণ্ডে এক পুস্তক রচনা করে। সেই শব্দের আদি কি, কে ঐ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করিয়াছিল, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, এইরূপ বিষয় লইয়াই কেহ হয়তো আলোচনা করিয়া গেলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেন ঃ এক আম বাগানে কয়েকজন লোক বেড়াইতে গিয়াছিল; বাগানে ঢুকিয়া তাহারা গনিতে আরম্ভ করিল, কটা আম গাছ, কোন্ গাছে কত আম, এক-একটা ডালে কত পাতা, আমের বর্ণ, আকার, প্রকার ইত্যাদি নানাবিধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার করিতে লাগিল। আর একজন ছিল বিচক্ষণ, সে এ সব গ্রাহ্য না করিয়া আম পাড়িতে লাগিল ও খাইতে লাগিল। বল দেখি, কে বেশি বুদ্ধিমান ? আম খাও, পেট ভরিবে, কেবল পাতা গনিয়া—হিসাব করিয়া লাভ কি ? এই পাতা-ডালপালা গোনা ও অপরকে উহার সংখ্যা জানাইবার চেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দাও। অবশ্য এরূপ কার্যের উপযোগিতা আছে, কিন্তু ধর্মরাজ্যে নয়। যাহারা এইরূপ পাতা গনিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিতর হইতে কখনো একটিও ধর্মবীর বাহির করিতে পারিবে না। ধর্ম—যাহা মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরবের জিনিস, তাহাতে পাতা-গোনারূপ অত পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। যদি তুমি ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন বা ঠিক কোন্ দিনে গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্যক নাই। গীতায় কর্তব্য ও প্রেম সম্বন্ধে যে সুন্দর শিক্ষা আছে, আগ্রহের সহিত তাহা অনুসরণ করাই তোমার কাজ। উহার সম্বন্ধে বা উহার প্রণেতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা কেবল

---

১ বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে।।—বিবেকচূড়ামণি, ৫৮

পণ্ডিতদের আমোদের জন্য। তাহারা যাহা চায়, তাহা লইয়াই থাকুক। তাহাদের পণ্ডিতি তর্কবিচারে 'শান্তিঃ শান্তিঃ' বলিয়া এস আমরা আম খাইতে থাকি।

দ্বিতীয়তঃ গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। অনেক সময়ে লোকে বলিয়া থাকে, 'গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যা বলেন, তাহাই বিচার করিতে হইবে। সেইটি লইয়াই কাজ করা প্রয়োজন।' এ কথা ঠিক নয়। গতি-বিজ্ঞান, রসায়ন বা অন্য কোন জড়-বিজ্ঞানের শিক্ষক যাহাই হউন না কেন; কিছু আসে যায় না। কারণ উহাতে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আচার্য অশুদ্ধচিত্ত হইলে তাঁহাতে আদৌ ধর্মালোক থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কী ধর্ম শিখাইবে? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিবার বা অপরে শক্তিসঞ্চার করিবার একমাত্র উপায়—হৃদয় ও মনের পবিত্রতা। যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, ততদিন ভগবদ্দর্শন বা সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার আভাসজ্ঞানও অসম্ভব। সুতরাং ধর্মাচার্যের সম্বন্ধে প্রথমেই দেখা আবশ্যক তিনি কি চরিত্রের লোক; তারপর তিনি কি বলেন, তাহাও দেখিতে হইবে। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক, তবেই তাঁহার কথার প্রকৃত একটা গুরুত্ব থাকে; কারণ তাহা হইলেই তিনি প্রকৃত শক্তি-সঞ্চারকের যোগ্য হইতে পারেন। নিজের মধ্যেই যদি সেই শক্তি না থাকে, তবে তিনি সঞ্চার করিবেন কি? গুরুর মন এরূপ প্রবল আধ্যাত্মিক-স্পন্দনবিশিষ্ট হওয়া চাই যে, তাহা যেন সমবেদনাবশে শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যায়। গুরুর বাস্তবিক কার্যই এই—কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিষ্যের বুদ্ধিশক্তি বা অন্য কোন শক্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়া নয়। বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গুরু হইতে শিষ্যে যথার্থই একটি শক্তি আসিতেছে। সুতরাং গুরুর শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ দেখা আবশ্যক, গুরুর উদ্দেশ্য কি? গুরু যেন অর্থ, নাম-যশ বা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মশিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন—সমগ্র মানবজাতির প্রতি শুদ্ধ প্রেমই যেন তাঁহার কার্যের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি শুদ্ধ প্রেমের মাধ্যমেই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। কোনরূপ স্বার্থপূর্ণ ভাব, লাভ বা যশের ইচ্ছা এক মুহূর্তে এই সঞ্চারের মাধ্যম নষ্ট করিয়া ফেলে। ভগবান প্রেমস্বরূপ, আর যিনি ভগবানকে প্রেমস্বরূপ বলিয়া জানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে ভগবদ্‌ভাব শিক্ষা দিতে পারেন।

যদি দেখ—গুরুতে এই-সব লক্ষণ বর্তমান, তবে জানিবে তোমার কোন আশঙ্কা নাই। নতুবা তাঁহার নিকট শিক্ষায় বিপদ আছে; যেহেতু তিনি যদি হৃদয়ে

সদ্‌ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, হয়তো অসদ্‌ভাব সঞ্চার করিবেন। এই বিপদ হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে সাবধান রাখিতে হইবে। 'যিনি বিদ্বান্, নিষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্'[১] তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে ইহা সহজেই প্রতীত হইবে যে, ধর্মে অনুরাগী হইবার, ধর্মের মর্মবোধ করিবার এবং উহা জীবনে পরিণত করিবার উপযোগী শিক্ষা যে-কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া যায় না। 'শিলাখণ্ডের নিকট ধর্মোপদেশ-শ্রবণ, নদীর কলনাদে গ্রন্থপাঠ ও সর্বত্র শুভদর্শন'[২] আলঙ্কারিক বর্ণনা হিসাবে সত্য বটে, কিন্তু যাহার নিজের মধ্যে সত্য বিকশিত হয় নাই, সে কখনো এগুলি হইতে এতটুকু জ্ঞানও আহরণ করিতে পারে না। পর্বত, নদী প্রভৃতি কাহাকে শিক্ষা দিতে পারে?—যাহার পবিত্র হৃদয়ে ভক্তি-কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই মানবাত্মাকে। আর যে আলোকে এই কমল সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠে, তাহা ব্রহ্মবিদ্ সদ্‌গুরুরই জ্ঞানালোক। যখন এইভাবে হৃদয় উন্মুক্ত হয়, তখন সেই হৃদয়—পর্বত, নদী, তারা, সূর্য, চন্দ্র অথবা এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা হইতেই শিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাহার হৃদয় এখনো উন্মুক্ত হয় নাই, সে এ-সকলে পর্বতাদি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। চিত্রশালায় গিয়া অন্ধের কিছুই লাভ নাই। আগে তাহাকে চক্ষু দাও, তবেই সে সেখানকার দর্শনীয় বস্তুসমূহ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় বুঝিতে পারিবে।

গুরুই ধর্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত শিষ্যেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আচরণ, তাঁহার নিকট শরণগ্রহণ ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্মের বিকাশ হইতেই পারে না। আর ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এরূপ সম্বন্ধ আছে, কেবল সেই-সব দেশেই অসাধারণ ধর্মবীরগণ জন্মিয়াছেন; আর যে-সব দেশে গুরুশিষ্যের এ সম্বন্ধ রক্ষা করা হয় নাই, সে-সব দেশে ধর্মের শিক্ষক কেবল বক্তামাত্র। নিজের

---

১ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।—বিবেকচূড়ামণি, ৩৩

২ And this our life exempt from public haunt ,
Finds tongues in trees, books in the running brooks.
Sermons in stones and good in everything.
——Shakespeare's '*As you like it*'. Act II Sc. i

প্রাপ্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি, আর শিষ্য কেবল গুরুর কথাগুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে উভয়েই নিজ নিজ পথ দেখেন—একে আর অপরের চিন্তা করেন না, এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম প্রায় অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়; আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চার করিবার কেহ নাই, গ্রহণ করিবারও কেহ নাই। এই-সব লোকের কাছে ধর্ম যেন ব্যবসায়ে পরিণত। তাহারা মনে করে, অর্থ দ্বারা ধর্ম ক্রয় করা যায়। ঈশ্বরেচ্ছায় ধর্ম যদি এত সুলভ হইত! তাহাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এরূপ হইবার নয়।

ধর্ম—সর্বোচ্চ জ্ঞানস্বরূপ যে ধর্ম, তাহা ধন-বিনিময়ে কিনিবার জিনিস নয়, গ্রন্থ হইতেও তাহা পাওয়া যায় না। জগতের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পার, হিমালয়, আল্পস্, ককেসাস্ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে পার, সমুদ্রের তলদেশ আলোড়ন করিতে পার, তিব্বতের চারিকোণে অথবা গোবি-মরুর চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে পার, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় ধর্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে এবং যতদিন না তুমি গুরু লাভ করিতেছ, কোথাও ধর্ম খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃনির্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-রূপে দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান সত্য শিব ও সুন্দরের অতি আশ্চর্য তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।

অবতার

যেখানে লোকে তাঁহার (ঈশ্বরের) নাম কীর্তন করে, সেই স্থান পবিত্র; আর যে-ব্যক্তি তাঁহার নাম করেন, তিনি আরও কত পবিত্র! আর যাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হই, তাঁহার নিকট কতই না ভক্তির সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত! ঐরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যের সংখ্যা খুব বিরল বটে, কিন্তু জগৎ একেবারে এই-সকল আচার্য-বিরহিত হয় না। যে মুহূর্তে পৃথিবী একেবারে আচার্যশূন্য হয়, সেই মুহূর্তেই উহা এক ভয়ানক নরককুণ্ডে পরিণত হয় ও বিনাশের দিকে ধাবিত হয়। আচার্যগণই মানবজাতির সুন্দরতম প্রকাশস্বরূপ এবং 'অহেতুক-দয়াসিন্ধু'।[১]

---

১ বিবেকচূড়ামণি, ৩৫

শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, 'আমাকে আচার্য বলিয়া জানিও।'[১] অর্থাৎ সাধারণ গুরুশ্রেণী অপেক্ষা উন্নততর আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন—ঈশ্বরের অবতারগণ। ইঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি—কেবল মাত্র ইচ্ছা দ্বারাই অপরের ভিতর ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছায় অতি দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও মুহূর্ত মধ্যে সাধু হইয়া যায়। ইঁহারগুরুরও গুরু,মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি; আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। মানুষ তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না; আর বাস্তবিক এই আচার্যগণকে উপাসনা করিতে আমরা বাধ্য।

এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যদি আর কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু গঠন করি এবং উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। গল্প আছে—এক আনাড়ীকে শিব গড়িতে বলা হয়, অনেক দিন চেষ্টা করিয়া সে একটি বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ ভগবানকে নির্গুণ পূর্ণস্বরূপে যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই আমরা শোচনীয়ভাবে বিফল হই; কারণ যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন তাঁহাকে মানুষভাবে ছাড়া অন্যভাবে কখনই ভাবিতে পারিব না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মনুষ্যপ্রকৃতি অতিক্রম করিয়া তাঁহার স্বরূপবোধে সমর্থ হইব, কিন্তু যতদিন সীমাবদ্ধ মানুষ থাকিব, ততদিন মানুষের ভিতর ও মানুষরূপেই তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে। যাই বল না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ভগবানকে মানব-ভাবে ছাড়া আর কোন ভাবে চিন্তা করিতে পার না। ঈশ্বর সম্বন্ধে বা জগতের অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধে খুব যুক্তিতর্কসমন্বিত বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, আর ভগবানের এই-সকল মনুষ্য-অবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক— এ কথা নিজের সন্তোষজনক ভাবে প্রমাণ করিতে পার, কিন্তু 'সহজ' বুদ্ধিতে কি বলে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। এই প্রকার অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির পশ্চাতে কি আছে? কিছুই নাই—শূন্য, কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র। তারপর যখন দেখিবে, কোন লোক এইরূপ অবতার পূজার বিরুদ্ধে মহাযুক্তিতর্কের সহিত বক্তৃতা করিতেছে, তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা কর: ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার নিজের ধারণা কি? 'সর্বশক্তিমত্তা', 'সর্বব্যাপিতা' ও এইরূপ শব্দগুলি দ্বারা কি বোঝ? দেখিবে,

১ আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ.....।—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৭।২৬

ঐগুলির বানান ব্যতীত সে আর অধিক কিছু বোঝে না। এসকল শব্দের দ্বারা তাহার মনে কোন অর্থেরই বোধ হয় না, এমন কোন ভাব দ্বারা সে ঐগুলি ব্যক্ত করিতে পারে না, যাহা তাহার মানবীয় প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। এই বিষয়ে রাস্তার যে লোকটা একখানা পুঁথিও পড়ে নাই, তাহার সহিত এ ব্যক্তির কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে সে লোকটা শান্তপ্রকৃতি, জগতের শান্তিভঙ্গ করে না, আর এই বক্তা সমাজে অশান্তি ও দুঃখ সৃষ্টি করে। বাস্তবিক প্রত্যক্ষানুভূতিতেই ধর্ম, সুতরাং শূন্যগর্ভ বক্তৃতা ও প্রত্যক্ষানুভূতির মধ্যে আমাদের বিশেষ প্রভেদ করা আবশ্যক। আত্মার গভীরতম প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষানুভূতি বলে। এই বিষয়ে 'সহজ' জ্ঞান যত দুর্লভ, আর কিছুই তত দুর্লভ নয়।

আমাদের বর্তমান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমরা সীমাবদ্ধ; ভগবানকে মনুষ্যরূপে দেখিতে আমরা বাধ্য। মনে কর, মহিষদের ভগবানকে পূজা করিবার ইচ্ছা হইল—তাহাদের স্বভাব অনুযায়ী তাহারা ভগবানকে একটি বৃহৎ মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের আরাধনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে ভাবিতে হইবে, ভগবান একটি বৃহৎ মৎস্য। মানুষকেও ভাবিতে হইবে, ভগবান মানুষ; আর ঐ-সকল সীমাবদ্ধ বিভিন্ন ধারণা বিকৃতকল্পনাসম্ভূত নয়। মানুষ, মহিষ, মৎস্য—এগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্বরূপ, সবগুলি ভগবৎ-সমুদ্রে নিজ নিজ ধারণ-শক্তি ও আকৃতি অনুসারে পূর্ণ হইয়াছে। মানুষে ঐ জল মানুষের আকার ধারণ করিল, মহিষে মহিষের আকার ও মৎস্যে মৎস্যাকার ধারণ করিল। প্রত্যেক পাত্রে সেই এক ঈশ্বর-সমুদ্রের জল রহিয়াছে। নিজ মনের প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী যদি কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা করে, আমরা তাহাকে দোষ দিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বরকে মানুষরূপেই উপাসনা করা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোন পথ নাই।

দুই প্রকার লোক ভগবানকে মানুষরূপে উপাসনা করে না। প্রথম—নরপশুগণ, যাহাদের কোনরূপ ধর্মজ্ঞান নাইঃ দ্বিতীয়—পরমহংসগণ, যাঁহারা মনুষ্যসুলভ সমুদয় দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া মানব প্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতিই তাঁহাদের আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারাই কেবল ভগবানকে তাঁহার স্বরূপে উপাসনা করিতে পারেন। অন্য সব বিষয়ে যেমন, এখানেও তেমনি—দুইটি চরম বিপরীত ভাব একরূপ দেখায়। অতিশয় অ-জ্ঞানী ও পরম জ্ঞানী—এদুয়ের কেহই উপাসনা করে না; নরপশুগণ অজ্ঞান বলিয়া উপাসনা করে না, জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সর্বদা আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে অনুভব

করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র উপাসনার প্রয়োজন হয় না। যে-ব্যক্তি এই দুই চূড়ান্তভাবে মধ্যবর্তী, অথচ বলে—আমি ভগবানকে মনুষ্যরূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি না, বিশেষ যত্নের সহিত সেই ব্যক্তির দেখাশুনা করা আবশ্যক। কঠোরতর ভাষা প্রয়োগ না করিয়াও বলিতে হয়, সে প্রলাপ বকিতেছে, সে ভুল করিয়াছে; তাহার ধর্ম বিকৃতমস্তিষ্ক ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণেরই উপযুক্ত।

ভগবান মানুষের দুর্বলতা বুঝেন এবং মানুষের হিতের জন্যই মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।[১] 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি। সাধুদের রক্ষা, পাপীগণের দুষ্কৃতিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।'[২] 'জগতের ঈশ্বর আমি, —আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনুষ্যরূপধারী আমাকে উপহাস করে।'[৩]

অবতার সম্বন্ধে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'যখন প্রবল বন্যা আসে, তখন সব ছোট ছোট নদী ও খানা কানায় কানায় ভরিয়া যায়; সেইরূপ যখনই অবতার আসেন, তখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগৎকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সাধারণ মানুষও তখন হাওয়াতেই ধর্মভাব অনুভব করে।'

মন্ত্র

আমরা কিন্তু এখানে মহাপুরুষ বা অবতারগণের কথা বলিতেছি না; এখন আমরা সিদ্ধ গুরুদিগের বিষয় আলোচনা করিব। তাঁহাদিগকে সচারচক মন্ত্র দ্বারা

১ স্যাৎ পরমেশ্বরস্য অপি ইচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।
—শাঙ্করভাষ্য, বেদান্তসূত্র, ১।১।২০

২ যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥——গীতা, ৪।৭-৮

৩ অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥——গীতা, ৯।১১

শিষ্যগণের ভিতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলি কি? ভারতীয় দর্শনের মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ মনুষ্যচিত্তে এমন একটি তরঙ্গ থাকিতে পারে না, যাহা নামরূপাত্মক নয়। যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে গঠিত, তাহা হইলে এই নামরূপাত্মকতা বিরাট ব্রহ্মাণ্ডেরওনিয়ম বলিতে হইবে। 'যেমন একটি মৃৎপিণ্ডকে জানিলে আর সমস্ত মৃত্তিকাকেই জানিতে পারা যায়,'[১] তেমনি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা দেহপিণ্ডকে জানিতে পারিলে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকেও জানিতে পারা যায়। রূপ বস্তুর বাহিরের আবরণ বা খোসা, আর নাম বা ভাব যেন উহার অন্তর্নিহিত শস্য। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে শরীরই রূপ, আর মন বা অন্তঃকরণই নাম, এবং বাক্‌শক্তিযুক্ত প্রাণিসমূহে এই নামের সহিত উহাদের বাচকশব্দগুলি নিত্যযুক্তভাবে বর্তমান। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে ব্যক্তিমানুষের ভিতরেই 'ব্যষ্টিমহৎ' বা চিত্তে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি উত্থিত হইয়া প্রথমে সূক্ষ্ম শব্দ বা ভাবরূপ—পরে তদপেক্ষা স্থূলতর আকার ধারণ করে।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ বা 'সমষ্টিমহৎ' প্রথমে নিজেকে নামে, পরে রূপাকারে অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করেন। এই ব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই 'রূপ'; ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত 'স্ফোট' রহিয়াছে। 'স্ফোট' বলিতে সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ 'শব্দব্রহ্ম' বুঝায়। সমুদয় নাম বা ভাবের উপাদান-স্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যাহা দ্বারা ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করেন; শুধু তাই নয়, ভগবান প্রথমে নিজেকে স্ফোটরূপে পরিণত করিয়া পরে অপেক্ষাকৃত স্থূল এই পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপে বিকশিত করেন। এই স্ফোটের একটিমাত্র বাচক শব্দ আছে—'ওঁ'। আর কোনরূপ বিশ্লেষণ-বলেই যখন আমরা ভাব হইতে শব্দকে পৃথক করিতে পারি না, তখন এই ওঙ্কার ও নিত্য-স্ফোট অবিভাজ্যরূপে বর্তমান। এজন্য শ্রুতি বলেন, সমুদয় নামরূপের উৎস—ওঙ্কার-রূপ এই পবিত্রতম শব্দ হইতে এই স্থূল জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তবে যদি বল—শব্দ ও ভাব নিত্যসম্বন্ধ বটে, কিন্তু একটি ভাবের বাচক বিবিধ শব্দ থাকিতে পারে, সুতরাং সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ ভাবের বাচক যে এই একটি বিশেষ শব্দ ওঙ্কার, তাহা মনে করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই

---

১ 'যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্' ইত্যাদি।—ছান্দোগ্য উপ, ৬।১।৪

আপত্তির উত্তরে আমরা বলি, ওঙ্কারই এইরূপ সর্বভাব-প্রকাশক বাচক শব্দ, আর কোন শব্দ ইহার তুল্য নয়। স্ফোটই সমুদয় ভাবের উপাদান, ইহা কোন একটি বিশেষ ভাব নয়; অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবগুলির মধ্যে পরস্পর যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা যদি দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই স্ফোটই অবশিষ্ট থাকিবে। প্রত্যেকটি বাচক শব্দ এক-একটি ভাব প্রকাশ করে, অতএব উহা স্ফোটের প্রতীক হইতে পারে না। কারণ স্ফোট সর্বভাবের সমষ্টি আর কোন বাচক শব্দ দ্বারা অব্যক্ত স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে উহা তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট করিয়া ফেলে যে, তাহাতে আর সমষ্টি-ভাব থাকে না, উহা একটি বিশেষভাবে পরিণত হয়। অতএব স্ফোটকে বুঝাইতে হইলে এমন একটি শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহা দ্বারা স্ফোট খুব অল্প পরিমাণে বিশেষভাবাপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি প্রায় যথাযথ ভাবে প্রকাশ করে, তাহাই উহার সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ প্রতীক বা বাচক।

শ্রুতি বলেন, ওঙ্কার—কেবলমাত্র ওঙ্কারই এইরূপ শব্দপ্রতীক। কারণ অ, উ, ম—এই তিনটি অক্ষর একত্র 'অউম্'-রূপে উচ্চারিত হইলে উহাই সর্বপ্রকার শব্দের সাধারণ বাচক হইতে পারে। সমুদয় শব্দের মধ্যে 'অ' সর্বাপেক্ষা কম বিশেষভাবাপন্ন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'অক্ষরের মধ্যে আমি অকার।'[১] আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দই মুখগহ্বরের মধ্যে জিহ্বামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ওষ্ঠ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। 'অ' কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত, 'ম' শেষ ওষ্ঠ্য বর্ণ। আর 'উ' জিহ্বামূল হইতে যে শক্তি আরম্ভ হইয়া ওষ্ঠে শেষ হয়, সেই শক্তিটি যেন গড়াইয়া যাইতেছে—এই ভাব প্রকাশ করে। প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দোচ্চারণ ব্যাপারটির সূচক; অন্য কোন শব্দেরই সেই শক্তি নাই; সুতরাং এই শব্দটিই স্ফোটের যোগ্যতম বাচক, আর এই স্ফোটই ওঙ্কারের প্রকৃত বাচ্য। এবং বাচ্য হইতে বাচক পৃথক করা যাইতে পারে না, সুতরাং এই 'ওঁ' এবং 'স্ফোট' এক ও অভিন্ন। এই জন্য স্ফোটকে বলা হয় 'নাদব্রহ্ম', আর যেহেতু এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের সূক্ষ্মতর দিক বলিয়া ঈশ্বরের নিকটতর এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, সেই হেতু ওঙ্কারই ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক। আর সেই একমাত্র 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দ' ব্রহ্মকে যেমন অপূর্ণ জীবাত্মাগণ

---

১ অক্ষরাণামকারোঽস্মি···· ।—গীতা, ১০।৩৩

বিশেষ বিশেষ ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিতে পারে, তেমনি তাঁহার দেহরূপ এই জগৎকেও সাধকের মনোভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে হইবে।

উপাসকের মনে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণের যখন যেটি প্রবল থাকে, তখন তাহার মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে তদনুযায়ী ভাবই উদিত হয়। ইহার ফল এই—একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন গুণপ্রাধান্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইবেন, আর সেই এক জগৎই ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইবে। সর্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্না সার্বভৌম বাচক ওঙ্কারে যেন বাচ্য ও বাচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তেমনি এই বাচ্য-বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব সম্বন্ধেও খাটিবে। আর ইহার সবগুলিরই বিশেষ বিশেষ বাচক শব্দ থাকা আবশ্যক। মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান ও জগতের এই বিশেষ বিশেষ খণ্ডভাব প্রকাশ করে। ওঙ্কার যেমন অখণ্ডব্রহ্মের বাচক, অন্যান্য মন্ত্রগুলিও সেইরূপ সেই পরমপুরুষের খণ্ড-ভাবগুলির বাচক। ঐ সবগুলিই ঈশ্বরধ্যানের ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়ক।

প্রতীক- ও প্রতিমা-উপাসনা

এইবার প্রতীকোপাসনা ও প্রতিমাপূজার বিষয় আলোচনা করিব। প্রতীক অর্থে যে-সকল বস্তু ব্রহ্মের পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য। প্রতীকে ভগবদুপাসনার অর্থ কি? ভগবান রামানুজ বলিয়াছেনঃ 'ব্রহ্ম নয়, এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে প্রতীকোপাসনা বলে।'[১] শঙ্করাচার্য বলিয়াছেনঃ 'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে—ইহা আধ্যাত্মিক, আকাশ ব্রহ্ম—ইহা আধিদৈবিক। মন আধ্যাত্মিক প্রতীক, এবং আকাশ বাহ্য প্রতীক—এই উভয়কেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ আদিত্যই ব্রহ্ম, ইহাই আদেশ....যিনি নামকে

---

১ অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাঽনুসন্ধানম্‌।—রামানুজ-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৫

ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন—ইত্যাদি স্থলে প্রতীকোপাসনা সম্বন্ধে সংশয় হয়।'[১] প্রতীক শব্দের অর্থ—বাহিরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনা-অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। শ্রুতিতে বর্ণিত প্রতীকের ন্যায় পুরাণ-তন্ত্রেও বহু প্রতীকের বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ-উপাসনা ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

এখন কথা এই ঃ ঈশ্বরকে—কেবল ঈশ্বরকে উপাসনা করার নামই ভক্তি। দেব, পিতৃ অথবা অন্য কোন উপাসনা ভক্তি-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত; উহা উপাসককে কেবল কোন প্রকার স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান করে, কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হয় না—উহা মুক্তিও দিতে পারে না। সুতরাং একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা আবশ্যক। দার্শনিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম হইতে জগৎ-কারণের উচ্চতম ধারণা আর হইতে পারে না; প্রতীকোপাসক কিন্তু অনেকস্থলে এই প্রতীককে ব্রহ্মের আসনে বসাইয়া উহাকে আপন অন্তরাত্মা বা অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করেন, এরূপ স্থলে সেই উপাসক সম্পূর্ণ বিপথে চালিত হন, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মই উপাস্য, আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ অথবা উহার উদ্দীপক কারণমাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র না দেখিয়া জগৎকারণরূপে চিন্তা করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাসনা বিশেষ উপকারী। শুধু তাই নয়, প্রবর্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়। সুতরাং যখন কোন দেবতাকে বা অন্য প্রাণীকে ঐ দেবতা বা ঐ প্রাণী-রূপেই উপাসনা করা হয়, তখন এরূপ উপাসনাকে একটি আনুষ্ঠানিক কর্মমাত্র বলা যাইতে পারে। আর উহা একটি 'বিদ্যা' বলিয়া উপাসক ঐ বিশেষ বিদ্যার ফল লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন কোন দেবতা বা অন্য কেহ ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত হন, তখন উহা সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপাসনার সহিত তুল্য হইয়া পড়ে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি—সর্বত্রই কোন দেবতা, মহাপুরুষ বা অন্য

---

১ মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেতি। তথা আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ। স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ।

... শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৪। সংশয়ের উত্তর পরবর্তী সূত্রের ভাষ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

কোন অলৌকিক পুরুষের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয় কেন। ব্যাখ্যাস্বরূপে অদ্বৈতবাদী বলেন, 'নামরূপ বাদ দিলে সকল বস্তুই কি ব্রহ্ম নয়?' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলেন, 'সেই প্রভুই কি সকলের অন্তরাত্মা নন?' শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, 'আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রহ্মই দেন, কারণ তিনিই সকলের অধ্যক্ষ। যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু-আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, তেমনি প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, সুতরাং এখানে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।'[১]

প্রতীক সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলা হইল, প্রতিমা সম্বন্ধেও সেই-সকল কথা খাটিবে, অর্থাৎ যদি প্রতিমা কোন দেবতা বা সাধুসন্তের সূচক হয়, তাহা হইলে সেইরূপ উপাসনাকে ভক্তি বলা যাইবে না, সুতরাং উহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে না। কিন্তু উহা সেই এক ঈশ্বরের সূচক হইলে উহার উপাসনায় ভক্তি ও মুক্তি—উভয়ই লাভ হয়। জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের কোন কোন সম্প্রদায় সাধকদের সহায়তার জন্য অবাধে পূর্বোক্তভাবে প্রতিমার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেবল মুসলমান ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম এই সহয়তা অস্বীকার করেন। তাহা হইলেও মুসলমানেরা তাঁহাদের সাধুসন্ত ও শহীদগণের কবর অনেকটা প্রতীক বা প্রতিমারূপেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রোটেস্ট্যান্টরা ধর্মে বাহ্য সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া দিতে গিয়া ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন, আর আজকাল খাঁটি প্রোটেস্ট্যান্টের সহিত অগস্ত কমতের চেলা বা নীতিমাত্র-প্রচারক অজ্ঞেয়বাদীদের কোন প্রভেদ নাই। আবার খ্রীস্ট বা ইসলামধর্মে প্রতিমাপূজার যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুতেও কেবল প্রতীক বা প্রতিমাই উপাসিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টিসৌকর্যার্থে নয়। সুতরাং উহা বড়জোর কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত মাত্র। অতএব উহা হইতে মুক্তি বা ভক্তি লাভ হইতে পারে না। এইপ্রকার প্রতিমাপূজাতে সাধক সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বস্তুতে আত্ম-সমর্পণ করে, সতুরাং মূর্তি বা কবর, মন্দির বা স্মৃতিস্তম্ভের এইরূপ ব্যবহারই প্রকৃত পুতুলপূজা।

---

১ ফলন্ত........আদিত্যাদ্যুপাসনেঽপি ব্রহ্মৈব দাস্যতি সর্বাধ্যক্ষত্বাৎ। ....ঈদৃশং চাত্র ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং, যৎ প্রতীকেষু তদদৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিষু ইব বিষ্ণুবাদীনাম্।—শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৫

কিন্তু তাহা হইলেও উহা কোন পাপকর্ম বা অন্যায় নয়, উহা একটি অনুষ্ঠান— একটি কর্মমাত্র ; উপাসকেরা অবশ্যই উহার ফল পাইয়া থাকেন।

ইষ্টনিষ্ঠা

এইবার ইষ্টনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। যে ভক্ত হইতে চায়, তাহার জানা উচিত, 'যত মত তত পথ'—তাহার জানা উচিত, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় সেই একই ভগবানের মহিমার বিভিন্ন বিকাশমাত্র।

'হে ভগবান, লোকে তোমাকে কত বিভিন্ন নামে ডাকিয়া থাকে—লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে যেন ভাগ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকটি নামেই তোমার পূর্ণশক্তি বর্তমান। যে উপাসক যে নামে উপাসনা করিতে ভালবাসে, তাহার নিকট তুমি সেই নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হও। তোমার প্রতি অন্তরাত্মার ঐকান্তিক অনুরাগ থাকিলে তোমাকে ডাকিবার কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। তোমার নিকট এত সহজে যাওয়া যায়, কিন্তু আমার দুর্দৈব—তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।'[১]

শুধু তাই নয়, ভক্ত যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা না করেন; এমন কি তাঁহাদের সমালোচনা-বিষয়েও যেন বিশেষ সতর্ক থাকেন ; তাঁহাদের নিন্দা শোনাও তাঁহার উচিত নয়। অবশ্য এমন লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা উদার, সহানুভূতিসম্পন্ন, অপরের গুণগ্রহণে সমর্থ, আবার গভীর ভগবৎ-প্রেমসম্পন্ন। সচরাচর দেখা যায়, উদারভাবাপন্ন সম্প্রদায়গুলি আধ্যাত্মিক গভীরতা হারাইয়া ফেলে। ধর্ম তাহাদের নিকট একপ্রকার রাজনীতিক-সামাজিকভাবাপন্ন সমিতির কার্যে পরিণত হয়। আবার খুব সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের নিজ আদর্শের প্রতি খুব ভালবাসা আছে বটে, কিন্তু

---

১ নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥—শিক্ষাষ্টকম্, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

তাহাদের এই ভালবাসার প্রতিটি বিন্দু অপর সকল সম্প্রদায়ের—যেগুলির মতের সহিত তাহাদের এতটুকুও পার্থক্য আছে—সেগুলির উপর ঘৃণা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ যদি পরম উদার অথচ গভীরপ্রেমসম্পন্ন জনগণে পূর্ণ হইয়া যাইত, বড় ভাল হইত! কিন্তু এইরূপ মহাত্মার সংখ্যা অতি বিরল। তথাপি আমরা জানি, জগতের অনেককে এই আদর্শে শিক্ষিত করা সম্ভব; আর ইহার উপায় এই 'ইষ্টনিষ্ঠা'।

প্রত্যেক ধর্মের প্রতিটি সম্প্রদায় মানুষকে শুধু নিজের আদর্শটি দেখাইয়া দেয়, কিন্তু সনাতন বৈদান্তিক ধর্ম ভগবানের সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনন্ত দ্বার খুলিয়া দেন, এবং মানবের সমক্ষে প্রায় অসংখ্য আদর্শ স্থাপন করেন। সেই আদর্শগুলির প্রত্যেকটিই সেই অনন্তস্বরূপের এক-একটি বিকাশ মাত্র। অতীত ও বর্তমানের মহামহিমময় ঈশ্বরতনয় বা ঈশ্বরের অবতারগণ মনুষ্যজীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর কঠিন পর্বত কাটিয়া যে-সকল বিভিন্ন পথ বাহির করিয়াছেন, পরমকরুণাপরবশ হইয়া বেদান্ত উহা মুমুক্ষু নরনারীগণকে দেখাইয়া দেন, আর বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে—এমন কি ভবিষ্যৎ মানবকেও সেই সত্য ও আনন্দের ধামে আহ্বান করেন, যেখানে মানবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ও অনন্ত আনন্দের অবস্থায় উন্নীত হয়।

ভক্তিযোগ এইরূপে ভগবৎপ্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির একটিকেও ঘৃণা বা অস্বীকার করিতে নিষেধ করেন। তথাপি গাছ যতদিন ছোট থাকে, ততদিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। অপরিণত অবস্থায় নানাপ্রকার ভাব ও আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ধর্মরূপ কোমল লতিকা মরিয়া যাইবে। অনেক লোক উদার ধর্মভাবের নামে অনবরত ভাবাদর্শ পরিবর্তন করিয়া নিজেদের বৃথা কৌতূহল মাত্র চরিতার্থ করে। নূতন নূতন বিষয় শোনা তাহাদের যেন একরূপ ব্যারাম—একরূপ নেশার ঝোঁকের মতো। তাহারা খানিকটা সাময়িক স্নায়বীয় উত্তেজনা চায়, সেটি চলিয়া গেলেই তাহারা আর একটির জন্য প্রস্তুত হয়। ধর্ম তাহাদের নিকট যেন আফিমের নেশার মতো হইয়া দাঁড়ায়, আর ঐ পর্যন্তই তাহাদের দৌড়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেনঃ আর একপ্রকার মানুষ আছে, তাহারা মুক্তা-ঝিনুকের মতো। মুক্তা-ঝিনুক সমুদ্রতল ছাড়িয়া স্বাতী-নক্ষত্রে পতিত বৃষ্টি-জলের জন্য উপরে আসে। যতদিন না ঐ জলের একটি বিন্দু পায়, ততদিন সে মুখ খুলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে, তারপর গভীর সমুদ্রতলে ডুব দেয় এবং যে পর্যন্ত না বৃষ্টিবিন্দুটি মুক্তায় পরিণত হয়, সে পর্যন্ত সেইখানেই বিশ্রাম করে।

এই উদাহরণে ইষ্টনিষ্ঠা-ভাবটি যেরূপ হৃদয়স্পর্শী কবিত্বের ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। ভক্তিপথে প্রবর্তকের এই একনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। হনুমানের ন্যায় তাঁহার বলা উচিত, 'যদিও লক্ষ্মীপতি ও সীতাপতি পরমাত্মস্বরূপে অভেদ, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।'[১] অথবা সাধু তুলসীদাস যেমন বলিতেন, 'সকলের সঙ্গে বস, সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ কর ; যে যাহাই বলুক না কেন, সকলকে হাঁ হাঁ বল, কিন্তু নিজের ভাব দৃঢ় রাখিও'[২], ভক্তিযোগীরও সেই প্রকার আচার অবলম্বন করা উচিত। ভক্তসাধক যদি অকপট হন, তবে গুরুদত্ত ঐ বীজমন্ত্র হইতেই আধ্যাত্মিক ভাবের সুবৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখার পর শাখা ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়া ধর্মজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিবে। পরিশেষে প্রকৃত ভক্ত দেখিবেন—যিনি সারা জীবন তাঁহার নিজের ইষ্টদেবতা, তিনিই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে উপাসিত।

ভক্তির সাধন

ভক্তিলাভের উপায় ও সাধন সম্বন্ধে ভগবান রামানুজ তাঁহার বেদান্তভাষ্যে লিখিয়াছেন, 'বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ হইতে ভক্তিলাভ হয়।'

'বিবেক' অর্থে রামানুজের মতে খাদ্যাখাদ্যবিচার। তাঁহার মতে খাদ্যদ্রব্যের অশুদ্ধির কারণ তিনটিঃ (১) জাতিদোষ অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ, যথা—রসুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি স্বভাবতঃ অশুচি খাদ্যের যে দোষ; (২) আশ্রয়দোষ অর্থাৎ পতিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তির হস্তে খাইলে যে দোষ; (৩) নিমিত্তদোষ অর্থাৎ কোন অশুচি বস্তুর, যথা—কেশ, ধূলি আদি সংস্পর্শজনিত

---

১ শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ।।

২ সবসে বসিয়ে সবসে রসিয়ে সবকা লীজিয়ে নাম।
হাঁ জী হাঁ জী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম ।।—দোঁহা, তুলসীদাস

দোষ। শ্রুতি বলেন, 'আহার শুদ্ধ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করিতে পারা যায়।'[১] রামানুজ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই খাদ্যাখাদ্যবিচার ভক্তিমার্গাবলম্বিগণের মতে চিরকালই একটি গুরুতর বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেক ভক্তসম্প্রদায় এই বিষয়টিকে অত্যন্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে একটি গুরুতর সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মনে রাখা উচিত, সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, এবং বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহারাই জগদ্রূপে পরিণত হয়, এগুলি প্রকৃতির গুণ ও উপাদান দুই-ই; সুতরাং ঐসকল উপাদানেই প্রত্যেকটি মানুষের দেহ নির্মিত। উহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমরা আহারের দ্বারা শরীরের ভিতর যে উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক সাহায্য হয়, সুতরাং আমাদিগকে খাদ্যাখাদ্যবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও শিষ্যেরা চিরকাল যে গোঁড়ামি করিয়া থাকে, তাহা যেন আচার্যগণের উপর আরোপিত না হয়।

বাস্তবিক খাদ্যের শুদ্ধি-অশুদ্ধি বিচার গৌণমাত্র। পূর্বোদ্ধৃত ঐ বাক্যটিই শঙ্কর তাঁহার উপনিষদ্‌ভাষ্যে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ বাক্যস্থ 'আহার' শব্দটি যাহা সচরাচর খাদ্য অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা তিনি অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতেঃ 'যাহা' আহৃত হয়, তাহাই আহার। শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান ভোক্তার অর্থাৎ আত্মার উপভোগের জন্য ভিতরে আহৃত হয়। এই বিষয়ানুভূতিরূপ জ্ঞানের শুদ্ধিকেই 'আহারশুদ্ধি' বলে। সুতরাং আহারশুদ্ধি অর্থে আসক্তি-দ্বেষ বা মোহ-শূন্য হইয়া বিষয়ের জ্ঞান আহরণ। সুতরাং এইরূপে জ্ঞান বা 'আহার' শুদ্ধ হইলে এইরূপ ব্যক্তির সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে অনন্ত পুরুষের যথার্থ স্বরূপজ্ঞান ও অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি আসিবে।[২]

শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যা দুইটি আপাতবিরোধী বলিয়া বোধ হইলেও

---

১ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।২৬।২

২ আহ্রিয়তে ইত্যাহারঃ শব্দাদিবিষয়জ্ঞানম্ ভোক্তুর্ভোগায়াহ্রিয়তে। তস্য বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিরাহারশুদ্ধিঃ, রাগদ্বেষমোহদোষৈরসংসৃষ্টং বিষয়বিজ্ঞান মিত্যর্থঃ। তস্যামাহারশুদ্ধৌ

উভয়টিই সত্য ও প্রয়োজনীয়। সূক্ষ্ম শরীর বা মনের সংযম স্থূল শরীরের সংযম হইতে উচ্চতর কাজ বটে, কিন্তু সূক্ষ্মের সংযম করিতে হইলে অগ্রে স্থূলের সংযম বিশেষ আবশ্যক। অতএব আহার সম্বন্ধে গুরুপরম্পরা যেসকল নিয়ম প্রচলিত আছে, প্রবর্তকের পক্ষে সেগুলি পালন করা আবশ্যক। কিন্তু আজকাল ভারতীয় অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদি বিচারের এত বাড়াবাড়ি, এত অর্থহীন নিয়মের বাঁধাবাঁধি, এত গোঁড়ামি দেখা যায় যে, মনে হয়—ধর্ম যেন রান্নাঘরে আশ্রয় লইয়াছে। কখনো যে ধর্মের মহান সত্যসমূহ সেখান হইতে বাহিরে আসিয়া আধ্যাত্মিকতার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ ধর্ম একপ্রকার জড়বাদ মাত্র। উহা জ্ঞান নয়, ভক্তি নয়, কর্মও নয়। উহা এক বিশেষ প্রকার পাগলামি মাত্র। যাহারা এই খাদ্যাখাদ্যের বিচারকেই জীবনের সার বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাদের গতি ব্রহ্মলোকে না হইয়া সম্ভবতঃ বাতুলালয়ের দিকেই হইবে। সুতরাং ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতা-রূপ উচ্চাবস্থা লাভের জন্য কিছুটা আবশ্যক, অন্যথা এই স্থিরতা সহজে লাভ করা যায় না।

তারপর 'বিমোক'। বিমোক এই অর্থে ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী গতি নিবারণ ও উহাদিগকে সংযত করিয়া নিজ ইচ্ছার অধীনে আনয়ন এবং ইহা সকল ধর্ম সাধনেরই কেন্দ্রীয় ভাব।

তারপর 'অভ্যাস' অর্থাৎ আত্মসংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস। কিন্তু সাধকের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রবল সংযমের অভ্যাস ব্যতীত ঈশ্বর ও আত্মবিষয়ক অনুভূতি কখনই সম্ভব নয়। মন যেন সর্বদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে। প্রথম প্রথম ইহা অতি কঠিন বোধ হয়, কিন্তু অধ্যবসায়-সহকারে চেষ্টা করিতে করিতে এরূপ চিন্তা করার শক্তি ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন নিগৃহীত হইয়া থাকে।'[১]

তারপর 'ক্রিয়া' অর্থাৎ যজ্ঞ। পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

সত্যাং তদ্বতোঽন্তঃকরণস্য সত্ত্বস্য শুদ্ধির্নৈর্মল্যং ভবতি ; সত্ত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং যথাবগতে ভূমাত্মনি ধ্রুবাবিচ্ছিন্না স্মৃতিরবিস্মরণং ভবতি। —শাঙ্করভাষ্য, ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।২৬

১ অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। —গীতা, ৬।৩৫

'কল্যাণ' অর্থে পবিত্রতা, আর এই পবিত্রতারূপ একমাত্র ভিত্তির উপর ভক্তিপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। বাহ্যশৌচ অথবা খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিচার—এ উভয়ই সহজ, কিন্তু অন্তঃশুদ্ধি ব্যতিরেকে উহাদের কোন মূল্য নাই। রামানুজ অন্তঃশুদ্ধিলাভের উপায়স্বরূপ নিম্নলিখিত গুণগুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেনঃ সত্য, আর্জব—সরলতা, দয়া—নিঃস্বার্থ পরোপকার, দান, অহিংসা—কায়মনোবাক্যে অপরের হিংসা না করা, অনভিধ্যা—পরদ্রব্যে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টাচরণের ক্রমাগত চিন্তা প্রভৃতি পরিত্যাগ। এই তালিকার মধ্যে অহিংসা-গুণটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা আবশ্যক। ভক্তকে সকল প্রাণিসম্বন্ধে এই অহিংসা-ভাব অবলম্বন করিতেই হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, মনুষ্যজাতির প্রতি অহিংসা-ভাব পোষণ করিলেই যথেষ্ট, অন্যান্য প্রাণিগণের প্রতি নির্দয় হইলে কোন ক্ষতি নাই; অহিংসা বাস্তবিক তাহা নয়। আবার কেহ কেহ যেমন কুকুর-বিড়ালকে লালন-পালন করেন বা পিপীলিকাকে চিনি খাওয়ান, কিন্তু মানুষ-ভ্রাতার গলা কাটিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অহিংসা বলিতে তাহাও বুঝায় না। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মহৎ ভাবই শেষ পর্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া যাইতে পারে, ভাল রীতিনীতিও যদি অন্ধভাবে অনুষ্ঠান করা হয়, তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলিও অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং দুঃখের বিষয়, অহিংসা-নীতিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কতকগুলি ধর্মসম্প্রদায়ের অপরিষ্কার সাধকেরা স্নান করে না, পাছে তাহাদের গায়ের পোকা মরিয়া যায়, কিন্তু সেজন্য তাহাদের মনুষ্যভ্রাতাগণকে যে যথেষ্ট অস্বস্তি ও অসুখ ভোগ করিতে হয়, সেদিকে তাহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই। তবে ইহারা বৈদিক ধর্মাবলম্বী নয়।

ঈর্ষা নাই দেখিলে বুঝিতে হইবে, সাধক অহিংসাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সাময়িক উত্তেজনায় অথবা কোনরূপ কুসংস্কার বা পুরোহিত-কুলের প্রেরণায় যে-কোন ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করিতে পারে বা কিছু দান করিতে পারে; কিন্তু তিনিই যথার্থ মানবপ্রেমিক, যিনি কাহারও প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করেন না। সংসারে দেখা যায়, তথাকথিত বড় বড় লোকেরা সকলেই সামান্য নাম-যশ বা দু-এক টুকরা স্বর্ণখণ্ডের জন্য পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত। যতদিন অন্তরে এই ঈর্ষা ভাব থাকে, ততদিন অহিংসা বহুদূর, নিরামিষাশী হইলেও তিনি অহিংসা হইতে বহুদূর। গরু মাংস খায় না—নিরামিষভোজী, মেষও তাই; তবে কি তাহারা

যোগী বা অহিংসাপরায়ণ? যে-কোন মূর্খ ইচ্ছা করিলেই মাংসাহার বর্জন করিতে পারে। শুধু এইজন্যই তাহাকে উদ্ভিদ্‌ভোজী জন্তুগণ অপেক্ষা বিশেষ উন্নত বলা যাইতে পারে না, খাদ্যবিশেষ ত্যাগ করিলেই কেহ জ্ঞানী হইয়া যায় না। যে ব্যক্তি নির্দয়ভাবে বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাকে ঠকাইয়া অর্থ লইতে পারে, অর্থের জন্য যে-কোন অন্যায় কার্য করিতে যাহার দ্বিধা নাই, সে যদি কেবল তৃণ ভোজন করিয়াও জীবনধারণ করে, তথাপি সে পশুরও অধম। যাঁহার হৃদয়ে কখনো অপরের অনিষ্ট-চিন্তা পর্যন্ত উদিত হয় না, যিনি শুধু বন্ধুর নয়—পরম শত্রুরও সৌভাগ্যে আনন্দিত, সারা জীবন প্রতিদিন শূকরমাংস খাইলেই তিনিই প্রকৃত ভক্ত, তিনিই প্রকৃত যোগী, তিনিই সকলের গুরু। সুতরাং এইটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্য রীতিনীতি কেবল অন্তঃশুদ্ধির সহায়কমাত্র; যেখানে বাহ্যবিষয়ে অত খুঁটিনাটি-বিচার করা অসম্ভব, সেখানে কেবল অন্তঃশৌচ-অবলম্বনই যথেষ্ট। সেই লোককে ধিক্, সেই জাতিকে ধিক্, যে-লোক বা যে-জাতি ধর্মের সার ভুলিয়া অভ্যাসবশে বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে মরণ-কামড়ে ধরিয়া থাকে, কোনমতে ছাড়িতে চায় না। যদি ঐ অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের পরিচায়ক হয়, তবেই উহাদের উপযোগিতা আছে বলিতে হইবে। প্রাণশূন্য হইলে উহাদিগকে নির্দয়ভাবে উৎপাটন করিয়া ফেলা উচিত।

'অনবসাদ' বা বল ভক্তিলাভের পরবর্তী সাধন। শ্রুতি বলেন, 'বলহীন ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না।'[১] এখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দৌর্বল্য লক্ষিত হইয়াছে। 'বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ'[২] ব্যক্তিই প্রকৃত শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত। দুর্বল, শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তি কী সাধন করিবে? শরীর ও মনের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তিসমূহ লুক্কায়িত আছে, কোনরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা সেগুলি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও জাগ্রত হইলে দুর্বল ব্যক্তি একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। যুবা, সুস্থকায়, সবল ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন। সুতরাং সিদ্ধিলাভের জন্য মানসিক বল যে-পরিমাণে প্রয়োজন, শারীরিক বলও সেই পরিমাণে চাই। ইন্দ্রিয়সংযমের প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহই সহ্য করিতে পারে। অতএব ভক্ত হইতে যাঁহার সাধ, তাঁহাকে সবল ও সুস্থকায় হইতে হইবে। যাহারা দুর্বল, তাহারা যদি কোনরূপ যোগাভ্যাসের চেষ্টা করে, তবে—হয় তাহারা কোন দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইবে,

১ 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'—মুণ্ডক উপ., ৩।২।৪

২ 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ...'—তৈত্তি. উপ., ২।৮।১

নতুবা মনকে ভয়ানক দুর্বল করিয়া ফেলিবে। ইচ্ছাপূর্বক শরীরকে দুর্বল করা ভক্তি বা জ্ঞানলাভের অনুকূল ব্যবস্থা নয়।

যাহার চিত্ত দুর্বল, সে আত্মলাভে কৃতকার্য হয় না। যে ভক্ত হইতে ইচ্ছুক, সে সর্বদা প্রফুল্ল থাকিবে। পাশ্চাত্যে অনেকের কাছে ধার্মিকের লক্ষণ—সে কখনো হাসিবে না, তাহার মুখ সর্বদা বিষাদমেঘে আবৃত থাকিবে, তাহার চোয়াল বসা ও মুখ লম্বা হওয়া আবশ্যক। শুষ্কশরীর ও লম্বামুখ লোক ডাক্তারের তত্ত্বাবধানের যোগ্য বটে, কিন্তু তাহারা কখনো যোগী হইতে পারে না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তিই অধ্যবসায়শীল হইতে পারে। দৃঢ়চেতা ব্যক্তিই সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। মায়াজাল ছিন্ন করিয়া বাহিরে যাওয়া—যোগ সাধন করা অতি কঠিন কার্য, দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বীরগণের দ্বারাই ইহা সম্ভব।

প্রফুল্লতা প্রয়োজন, তাই বলিয়া অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে চলিবে না (অনুদ্ধর্ষ)। অতিরিক্ত হাস্যকৌতুক আমাদিগকে গভীর চিন্তায় অক্ষম করিয়া ফেলে, উহাতে মানসিক শক্তিসমূহের বৃথা ক্ষয় হয়। ইচ্ছাশক্তি যত দৃঢ় হয়, নানাবিধ ভাবের বশে মন তত কম বিচলিত হয়। বিষাদপূর্ণ গম্ভীর ভাব যেমন সাধনার প্রতিকূল, অতিরিক্ত আমোদও সেইরূপ। মন যখন স্থির শান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, তখনই আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্ভব।

এই-সকল সাধন দ্বারা সাধক শিখিবে, কি ভাবে ভগবানকে ভালবাসিতে হয়। এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা 'গৌণী ভক্তি'।

পরাভক্তি

ভক্তির প্রস্তুতি—ত্যাগ

গৌণী ভক্তির কথা সংক্ষেপে শেষ করিয়া আমরা পরাভক্তি আলোচনায় প্রবেশ করিতেছি। এখন এই পরাভক্তি-অভ্যাসের জন্য প্রস্তুত হইবার শেষ সাধনটির কথা বিবেচনা করা যাক। সর্বপ্রকার সাধনের উদ্দেশ্য আত্মশুদ্ধি—নাম-সাধন, প্রতীক ও প্রতিমাদির উপাসনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান কেবল আত্মশুদ্ধির জন্য। কিন্তু শুদ্ধিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই

সর্বশ্রেষ্ঠ—উহা ব্যতীত কেহ এই পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না। অনেকের পক্ষে এই ত্যাগ অতি ভয়াবহ ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগ ব্যতীত কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নয় : সকল যোগেই আবশ্যক। এই ত্যাগই ধর্মের সোপান—সমুদয় সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে—ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম। যখন মানবাত্মা সংসারের সমুদয় বস্তু দূরে ফেলিয়া গভীর তত্ত্বসমূহ অনুসন্ধান করে, যখন চৈতন্যস্বরূপ মানব বুঝিতে পারে, দেহরূপ জড়ে বদ্ধ হইয়া জড় হইয়া যাইতেছি এবং ক্রমশঃ বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি, তখন সে জড়পদার্থ হইতে নিজের দৃষ্টি সরাইয়া লয়—তখনই ত্যাগ আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয়। কর্মযোগী সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করেন, তিনি যে-সকল কর্ম করেন, তাহার ফলে তিনি আসক্ত হন না। তিনি ঐহিক বা পারত্রিক কোন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন না। রাজযোগীর মতে সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য—পুরুষ বা আত্মাকে বিচিত্র সুখদুঃখ ভোগ করানো। ইহার ফলে আত্মা বুঝিতে পারেন, প্রকৃতি হইতে তিনি নিত্য স্বতন্ত্র বা পৃথক। মানবাত্মাকে জানিতে হইবে—তিনি চিরকাল চৈতন্যস্বরূপই ছিলেন, আর জড়ের সহিত তাঁহার সংযোগ কেবল সাময়িক, ক্ষণিকমাত্র। রাজযোগী প্রকৃতির সমুদয় সুখদুঃখ ভোগ করিয়া অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বৈরাগ্যের শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞানযোগীর বৈরাগ্য সর্বাপেক্ষা কঠোর। কারণ তাঁহাকে প্রথম হইতেই এই বাস্তবরূপে দৃশ্যমান প্রকৃতিকে মিথ্যা মায়া বলিয়া জানিতে হয়। তাঁহাকে বুঝিতে হয়, প্রকৃতিতে যত কিছু শক্তির প্রকাশ দেখিতেছি, সবই আত্মার শক্তি, প্রকৃতির নয়। তাঁহাকে প্রথম হইতেই জানিতে হয়, সর্বপ্রকার জ্ঞান—সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা আত্মাতেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, প্রকৃতিতে নাই। সুতরাং কেবল বিচার-জনিত ধারণার বলে তাঁহাকে একেবারে সমুদয় প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থ ইন্দ্রজালের ন্যায় তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়, তিনি স্ব-মহিমায় বিরাজ করিতে চেষ্টা করেন।

সকল প্রকার বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগীর বৈরাগ্য খুব স্বাভাবিক। ইহাতে কোন কঠোরতা নাই, জোর করিয়া কিছু ছাড়িতে হয় না। ভক্তের ত্যাগ অতি সহজ—চারিদিকের দৃশ্যের মতোই অতি স্বাভাবিক ; এই ত্যাগেরই প্রকাশ আমরা আমাদের চতুর্দিকে প্রতিদিন দেখিতে পাই—যদিও অল্প-বিস্তর বিকৃতরূপে। কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালবাসিতে শুরু করিল ; কিছুদিন বাদে সে আর

একজনকে ভালবাসিল, প্রথমটিকে ছাড়িয়া দিল। ঐ প্রথম নারীটির চিন্তা ধীরে ধীরে শান্তভাবে তাহার মন হইতে চলিয়া গেল ; সে আর ঐ নারীর অভাব বোধ করিল না। এবার মনে কর, কোন নারী কোন পুরুষকে ভালবাসিতেছে। সে আবার যখন অপর এক পুরুষকে ভালবাসে, তখন এই প্রথম পুরুষটির কথা যেন তাহার মন হইতে সহজেই চলিয়া যায়। কোন লোক হয়তো নিজের শহরকে ভালবাসে। ক্রমশঃ সে নিজের দেশকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহার নিজের ক্ষুদ্র শহরের জন্য যে প্রগাঢ় ভালবাসা, তাহা স্বভাবতই চলিয়া গেল। আবার মনে কর, কোন লোক সমুদয় জগৎকে ভালবাসিতে শিখিল, তখন তাহার স্বদেশানুরাগ, নিজ দেশের জন্য প্রবল উন্মত্ত ভালবাসা চলিয়া যায়। তাহাতে তাহার কিছু কষ্ট হয় না। এই ভাব তাড়াইবার জন্য তাহাকে কিছু জোর করিতে হয় না। অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত, শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় অধিকতর সুখ পাইতে থাকে। তখন সে বিষয়ভোগে আর তত সুখ পায় না। কুকুর ও ব্যাঘ্র খাদ্য পাইলে যেরূপ স্ফূর্তির সহিত ভোজন করিতে থাকে, কোন মানুষের পক্ষে সেরূপ করা সম্ভব নয়। আবার মানুষ বুদ্ধিবলে নানা বিষয় জানিয়া ও নানা কার্য সম্পাদন করিয়া যে সুখ অনুভব করে, কুকুর কখনো তাহা অনুভব করিতে পারে না। প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে সুখানুভূতি হইয়া থাকে, কিন্তু যখনই কোন প্রাণী জীবনের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়, তখনই এই নিম্নজাতীয় সুখের মূল্য তাহার কাছে কমিয়া যায়। মনুষ্যসমাজে দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয়, সে ততই তীব্রভাবে ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করে ; আর যতই তাহার শিক্ষাদির উন্নতি হয়, ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় ও এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাহার সুখানুভূতি হইতে থাকে। এইরূপে মানুষ যখন বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, তখন যে আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যানুভূতির ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমন এক আনন্দের অবস্থা লাভ করে, যাহার তুলনায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনজনিত সুখ শূন্য বলিয়া মনে হয়। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যখন চন্দ্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পায়, তখন তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আবার সূর্য উদিত হইলে চন্দ্রও নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করে। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কোন কিছুকে নষ্ট করিয়া পাইতে হয় না। যেমন কোন ক্রমবর্ধমান আলোকের নিকট অল্পোজ্জ্বল আলোক স্বভাবতই ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতে হইতে শেষে একেবারে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ ভগবৎপ্রেমোন্মত্ততায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি- ও বুদ্ধিবৃত্তি-জনিত সুখসমূহ স্বভাবতই নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

এই ঈশ্বরপ্রেম ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে 'পরাভক্তি' বলে। যে সাধক ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ প্রেম লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকে না, শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না; প্রতিমা, মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, দেশ, জাতি—এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও বন্ধন আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিছুই আর তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না, কিছুই তাঁহার স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারে না। জাহাজ হঠাৎ চুম্বকপ্রস্তরের পাহাড়ের নিকট আসিলে পেরেকগুলি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া যায় আর তক্তাগুলি জলের উপর ভাসিতে থাকে। ভগবৎকৃপা এইরূপে আত্মার বন্ধন অর্থাৎ তাহার স্বরূপ-প্রকাশের বিঘ্নসমূহ অপসারিত করিয়া দেয়, তখন উহা মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিলাভের উপায়স্বরূপ এই বৈরাগ্য-সাধনে কোন কঠোরতা নাই, কোন কর্কশ বা শুষ্ক ভাব নাই, কোনরূপ সংগ্রাম নাই। ভক্তকে তাঁহার হৃদয়ের কোন ভাবই দমন করিতে হয় না, চাপিয়া রাখিতে হয় না, তাঁহাকে বরং সেই-সকল ভাব প্রবল করিয়া ভগবানের দিতে চালিত করিতে হয়।

ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত

প্রকৃতিতে আমরা সর্বত্রই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ—সবই প্রেমপ্রসূত; আবার কুৎসিত এবং পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেমশক্তির বিকার মাত্র। যে চিত্তবৃত্তি হইতে পতিপত্নীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম উদ্ভূত, অতি নীচ কামবৃত্তিও সেই একই খনি হইতে সঞ্জাত। ভাব সেই একই, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার প্রকাশ বিভিন্ন। এই একই প্রেম কাহাকেও ভাল কাজে প্রেরণা দেয় এবং সে দরিদ্রকে সর্বস্ব অর্পণ করে, আবার কেহ বা ইহারই প্রভাবে নিজ ভ্রাতার গলা কাটিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেকে যেমন ভালবাসে, প্রথম ব্যক্তি অপরকে সেইরূপ ভালবাসে। দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রেম ভ্রান্ত পথে চালিত; কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে উহা ঠিক পথে প্রযুক্ত। যে-অগ্নিতে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাই আবার একটি শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহাতে অগ্নির কিছু দোষ নাই, ব্যবহারে

ও ফলে তারতম্য হয়। অতএব যে-প্রেমকে দুই ব্যক্তির প্রবল আসঙ্গস্পৃহা বলা যায়, তাহাই আত্মার অবশেষে উচ্চনীচ সর্বপ্রাণীর সেই এক স্বরূপে বিলীন হইবার ইচ্ছারূপে সর্বত্র প্রকাশিত।

ভক্তিযোগ প্রেমের এই উচ্চতম বিকাশের বিজ্ঞানস্বরূপ। উহা আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার, প্রেমকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার, উহাকে একটি নূতন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার এবং উহা হইতে শ্রেষ্ঠ ফল—আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন করে। ভক্তিযোগ বলে না—ত্যাগ কর বা ছাড়িয়া দাও ; শুধু বলে—ভালবাস, সেই উচ্চতম আদর্শকে ভালবাস। যাহার প্রেমের আস্পদ ঐরূপ, সর্বপ্রকার নীচভাব স্বভাবতই তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইবে।

'তোমার সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলিতে পারি না, শুধু বলিতে পারি ঃ তুমি আমার প্রেমাস্পদ। তুমি সুন্দর, আহা! অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্যস্বরূপ!' —হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভক্তেরা চিরকাল এইরূপ বলেন। ভক্তিযোগে আমাদের শুধু এইটুকু করিতে হইবে—সুন্দরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা ভগবানের দিকে চালিত করিতে হইবে। প্রাণের সহিত ভালবাস। মানুষের মুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের সর্বব্যাপী সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশমাত্র। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'তাঁহারই প্রকাশে সকলের প্রকাশ।'[১] ভক্তির এই উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হও। উহা একেবারে তোমাদের ক্ষুদ্র আমিত্ব ভুলাইয়া দিবে। জগতের ক্ষুদ্র স্বার্থপর আসক্তিসমূহ ত্যাগ কর। কেবল মানুষকেই তোমার সাধারণ বা তদপেক্ষা উচ্চতর কার্য-প্রবৃত্তির একমাত্র লক্ষ্য মনে করিও না। সাক্ষিরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতির সমুদয় ব্যাপার পর্যবেক্ষণ কর। মানুষের প্রতি আসক্তিশূন্য হও। দেখ, জগতে এই প্রবল প্রেমের ভাব কিরূপে কার্য করিতেছে। কখনো কখনো হয়তো একটা ধাক্কা আসিল ; উহাও সেই পরমপ্রেমলাভের চেষ্টার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। হয়তো কোথাও একটু দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ ঘটিল, হয়তো কাহারও পদস্খলন হইল—এ-সবই সেই প্রকৃত উচ্চতর প্রেমে আরোহণ করিবার সোপানমাত্র। সাক্ষিস্বরূপ একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখ, কিভাবে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ

---

১ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্।
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥—কঠ উপ., ২।২।১৫

মানুষকে প্রকৃত প্রেমের পথে আগাইয়া দেয়। যখন কেহ এই সংসার-প্রবাহের মধ্যে থাকে, তখনই সে ঐ সংঘর্ষগুলি অনুভব করে। কিন্তু যখনই উহার বাহিরে আসিয়া কেবল সাক্ষিরূপে পর্যবেক্ষণ করিবে, তখন দেখিবে—অনন্ত প্রণালীর মধ্য দিয়া ভগবান নিজেকে প্রেমরূপে প্রকাশিত করিতেছেন।

'যেখানেই একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে সেই অনন্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের অংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে।'[১] অতি নিম্নভাবের আসক্তিতেও ভগবৎপ্রেমের বীজ অন্তর্নিহিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় ভগবানের একটি নাম 'হরি'। ইহার অর্থ এই—তিনি সকলকেই নিজের কাছে আ-হরণ করিতেছেন বা আকর্ষণ করিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই আমাদের ভালবাসার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। এই যে আমরা নানাদিকে আকৃষ্ট হইতেছি, কিন্তু আমাদিগকে টানিতেছে কে? তিনিই আমাদিগকে তাঁহার দিকে ক্রমাগত টানিতেছেন। প্রাণহীন জড়—সে কি কখনো চৈতন্যবান আত্মাকে টানিতে পারে? কখনই পারে না, কখনো পারিবেও না। একখানি সুন্দর মুখ দেখিয়া একজন উন্মত্ত হইল। গোটাকতক জড়-পরমাণু কি তাহাকে পাগল করিল? কখনই নয়। ঐ জড়-পরমাণুসমূহের অন্তরালে নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক শক্তি ও ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা বিদ্যমান। অজ্ঞ লোকে উহা জানে না, তথাপি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে উহা দ্বারাই—কেবল উহা দ্বারাই আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং দেখা গেল, অতি নিম্নতম আসক্তিও ঈশ্বর হইতে শক্তি সংগ্রহ করে।—'হে প্রিয়তমে, পতির জন্য কেহ পতিকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই পত্নী পতিকে ভালবাসে।' প্রেমিকা পত্নীগণ ইহা জানিতে পারে, না জানিতেও পারে, তথাপি তত্ত্বটি সত্য। 'হে প্রিয়তমে, পত্নীর জন্য কেহ পত্নীকে ভালবাসে না, আত্মার জন্যই পত্নী প্রিয়া হয়।'[২]

এইরূপ কেহই নিজ সন্তানকে অথবা আর কাহাকেও তাহাদেরই জন্য ভালবাসে না, আত্মার জন্যই ভালবাসিয়া থাকে। ভগবান যেন একটি বৃহৎ চুম্বক প্রস্তর, আমরা যেন লৌহচূর্ণের ন্যায়। আমরা সকলেই সদাসর্বদা তাঁহার দ্বারা

---

১ এতস্যৈবানন্দস্য...ইত্যাদি—বৃহ. উপ., ৪।৩।৩২

২ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
—বৃহ. উপ., ২।৪।৫

আকৃষ্ট হইতেছি। আমরা সকলেই তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। জগতে এই যে নানাবিধ চেষ্টা—এই-সকলের একমাত্র লক্ষ্য কেবল স্বার্থ হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানে না, তাহারা কি করিতেছে। বাস্তবিক তাহারা জীবনের সকল চেষ্টার মধ্য দিয়া ক্রমাগত সেই পরমাত্মা-রূপ বৃহৎ চুম্বকের নিকটবর্তী হইতেছে। আমাদের এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের লক্ষ্য—তাঁহার নিকট যাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার সহিত একীভূত হওয়া।

ভক্তিযোগীই এই জীবন-সংগ্রামের অর্থ জানেন ও ইহার উদ্দেশ্য বুঝেন, তিনি এই সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন ; সুতরাং তিনি জানেন, ইহার লক্ষ্য কি, এই জন্য তিনি সর্বান্তঃকরণে এগুলি হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন। এ-সকল এড়াইয়া তিনি সকল আকর্ষণের মূলকারণ হরির নিকট একেবারে যাইতে চান। ইহাই ভক্তের ত্যাগ—ভগবানের প্রতি এই প্রবল আকর্ষণ তাঁহার আর সকল আসক্তিকে নাশ করিয়া দেয়। এই অনন্ত প্রেম তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, অন্যান্য আসক্তির আর সেখানে স্থান হয় না। ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে ? ঈশ্বর-রূপ প্রেমসমুদ্রের জলে ভক্তি তখন ভক্তের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। সেখানে ছোটখাট ভালবাসার স্থান আর নাই। ইহাই ভক্তের ত্যাগ বা বৈরাগ্য। তাৎপর্য এই ঃ ভগবান ভিন্ন সমুদয় বিষয়ে ভক্তের যে বৈরাগ্য, তাহা ভগবানের প্রতি পরম অনুরাগ হইতে উৎপন্ন।

পরাভক্তি-লাভের জন্য এইভাবে প্রস্তুত হওয়াই আবশ্যক। এই বৈরাগ্যলাভ হইলে পরাভক্তির উচ্চতম শিখরে উঠিবার দ্বার যেন খুলিয়া যায়। তখনই আমরা বুঝিতে আরম্ভ করি, পরাভক্তি কি। আর যিনি পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, একমাত্র তাঁহারই বলিবার অধিকার আছে, ধর্মানুভূতির জন্য তাঁহার পক্ষে প্রতিমাপূজা বা অনুষ্ঠানাদি নিষ্প্রয়োজন। তিনিই কেবল সেই পরম প্রেমাবস্থা লাভ করিয়াছেন, যেখানে সকল মানবের ভ্রাতৃত্ব অনুভব করা সম্ভব ; অপরে কেবল ইহা লইয়া বৃথা বাক্যব্যয় করে। তিনি তখন আর কোন ভেদ দেখিতে পান না ; মহান প্রেমসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে ; তখন তিনি আমাদের মতো মানুষ, পশু, তরু, লতা, সূর্য, চন্দ্র, তারা দেখেন না, তিনি সর্বত্র সব-কিছুর মধ্যে তাঁহার প্রিয়তমকে দেখিতে পান। যাহার মুখের দিকে তিনি তাকান, তাহারই ভিতরে তিনি হরির প্রকাশ দেখিতে পান। সূর্য বা চন্দ্রের আলোক তাঁহারই প্রকাশমাত্র। যেখানেই তিনি কোন সৌন্দর্য বা মহত্ত্ব দেখিতে পান, সেখানেই তিনি অনুভব করেন—সবই সেই ভগবানের। এরূপ ভক্ত জগতে

এখনও আছেন, জগৎ কখনই এরূপ ভক্ত-বিরহিত হয় না। এরূপ ভক্ত সর্পদষ্ট হইলে বলে—আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে দূত আসিয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কিছু বলিবার অধিকার আছে। তাঁহার হৃদয়ে কখনো ক্রোধ বা ক্ষোভের সঞ্চার হয় না। বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাঁহার নিকট হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত। যখন প্রেমবলে অতীন্দ্রিয় সত্যকে তিনি সর্বদা দেখিতে পান, তখন কি করিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন?

ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও উহার রহস্য

অর্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'যাঁহারা সর্বদা অবহিত হইয়া তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা অব্যক্ত নির্গুণের উপাসক, এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী?' শ্রীভগবান বলেন, 'যাঁহারা আমাতে মন সংলগ্ন করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। যাঁহারা ইন্দ্রিয়সংযম ও বিষয়ে সমবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া নির্গুণ, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, নির্বিকার, অচল নিত্যস্বরূপকে উপাসনা করেন, সেই সর্বভূতহিতে রত ব্যক্তিগণও আমাকে লাভ করেন। কিন্তু যাঁহাদের মন অব্যক্তে আসক্ত, তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট হইয়া থাকে; কারণ দেহাভিমানী ব্যক্তি অতি কষ্টে এই নির্গুণ ব্রহ্মে নিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা সমুদয় কার্য আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে শীঘ্রই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করি, কারণ তাঁহাদের মন সর্বদাই আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত।'[১] এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এমন কি, উদ্ধৃতাংশে উভয়েরই লক্ষণ প্রকাশ করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। জ্ঞানযোগ অবশ্য অতি মহান; উহা তত্ত্ববিচারের দ্বারা পরব্রহ্মকে অনুভব করিবার

---

১ গীতা, ১২।১-৭

পথ। আর আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্যেকেই ভাবে—তত্ত্ববিচারের দ্বারা সে সব-কিছু করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানযোগ অনুসারে জীবনযাপন বড় কঠিন ব্যাপার, উহাতে অনেক বিপদাশঙ্কা আছে।

জগতে দুইপ্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল আসুরপ্রকৃতি—তাহারা এই শরীরটাকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে রাখাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে করে। আর যাঁহারা দেবপ্রকৃতি, তাঁহারা এই শরীরকে কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন, উহা যেন আত্মার উন্নতি-সাধনের যন্ত্রবিশেষ। কথিত আছে, শয়তান নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শাস্ত্র উদ্ধৃত করিতে পারে, করিয়াও থাকে। সুতরাং জ্ঞানমার্গ যেমন সাধুব্যক্তির উচ্চতম আদর্শলাভের প্রবল উৎসাহদাতা, সেইরূপ অসাধু ব্যক্তিরও কার্যের সমর্থক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানযোগে ইহাই মহা বিপদাশঙ্কা। কিন্তু ভক্তিযোগ অতি স্বাভাবিক ও মধুর। ভক্ত জ্ঞানযোগীর মতো অত উচ্চ স্তরে উঠেন না, সুতরাং তাঁহার গভীর পতনের আশঙ্কাও নাই। এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, সাধক যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, যতদিন না সমুদয় বন্ধন মোচন হইতেছে, ততদিন তিনি কখনই মুক্ত হইতে পারেন না। প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ভক্ত এই সহজ পথ বাছিয়া লইয়া কিভাবে মুক্তিলাভ করিবেন?

এই কয়েকটি শ্লোকে দেখা যায়, প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা কিরূপে জনৈকা ভাগ্যবতী গোপীর জীবাত্মার পাপপুণ্যরূপ বন্ধন চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 'ভগবানের চিন্তাজনিত পরমাহ্লাদে তাঁহার সমুদয় পুণ্যকর্মজনিত বন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, আর ভগবানকে কাছে না পাওয়ার মহাদুঃখে তাঁহার সমুদয় পাপ ধৌত হইয়া গেল। তখন কোন বন্ধন না থাকায় সেই গোপকন্যা মুক্তিলাভ করিলেন।'[১] এই শাস্ত্রবাক্য হইতে বেশ বুঝা যায়, ভক্তিযোগের গুপ্তরহস্য এই যে, মনুষ্যহৃদয়ের যত প্রকার বাসনা বা ভাব আছে, উহার কোনটিই স্বরূপতঃ মন্দ নয়; ঐগুলিকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ক্রমশঃ উচ্চাভিমুখী করিতে হইবে—যতদিন না ঐ ভাবগুলি চরমোৎকর্ষ লাভ করে। উহাদের সর্বোচ্চ গতি ভগবান, এবং অন্যান্য সকল গতিই

১ তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা।।
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা।।—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৩।২১-২২

নিম্নাভিমুখী। ফল অনুসারে আমাদের সমুদয় মনোভাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—সুখ ও দুঃখ; শেষোক্ত মনোভাবকে কি করিয়া উচ্চাভিমুখী করা যায়, তাহা ভাবিয়া সাধক দিশেহারা হন। কিন্তু ভক্তিযোগ শিক্ষা দেয়—ইহা সত্য-সত্যই সম্ভব। দুঃখের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিষয় বা ধন লাভ করিতে না পারিয়া যখন কেহ দুঃখ পায়, তখন দুঃখবৃত্তিকে ভুল পথে চালিত করা হইতেছে। 'কেন আমি সেই পরম পুরুষকে লাভ করিতে পারিলাম না? কেন আমি ভগবানকে পাইলাম না?'—এই বলিয়া যদি কেহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তবে সেই যন্ত্রণা তাহার মুক্তির কারণ হইবে। কয়েকটি মুদ্রা পাইলে যখন তোমার আহ্লাদ হয়, তখন বুঝিতে হইবে, তুমি তোমার আহ্লাদ-বৃত্তিকে ভুল পথে চালাইতেছ। উহাকে উচ্চতর বিষয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, আমাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ভগবানের চিন্তায় আনন্দ বোধ করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও এই একই কথা। ভক্ত বলেন, উহাদের কোনটিই মন্দ নয়; সুতরাং তিনি ঐ ভাবগুলি বশীভূত করিয়া নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বরাভিমুখী করেন।

ভক্তির প্রকারভেদ

ভগবানে ভক্তি যতভাবে প্রকাশিত হয়, এখানে তাহার কয়েকটি আলোচিত হইতেছে।[১] প্রথম—'শ্রদ্ধা'। লোকে মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? এই-সকল স্থানে ঈশ্বরের পূজা হয় বলিয়া, এই-সকল স্থানে গেলে ঈশ্বরের ভাবের উদ্দীপনা হয় বলিয়া এই-সকল স্থানের সহিত ঈশ্বরের সত্তা জড়িত। সকল দেশেই লোকে ধর্মাচার্যগণের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? তাঁহারা সকলেই সেই এক ভগবানের মহিমাই প্রচার করেন; তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এই শ্রদ্ধার মূল ভালবাসা। যাহাকে আমরা ভালবাসি না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি না।

---

১ সম্মান-বহুমানপ্রীতিবিরহেতর-বিচিকিৎসা-মহিমখ্যাতিতদর্থপ্রাণস্থান-
তদীয়তাসর্বতদ্ভাবাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ। —শাণ্ডিল্যসূত্র; (২।১) ৪৪

তারপর 'প্রীতি'—ভগবচ্চিন্তায় সুখ বা আনন্দ অনুভব। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মানুষ কি তীব্র আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে! ইন্দ্রিয়সুখকর দ্রব্য লাভ করিতে মানুষ সর্বত্র ছুটিয়া যায়, মহাবিপদেরও সম্মুখীন হয়। ভক্তের চাই ঠিক এই প্রকার ভালবাসা। ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরাইতে হইবে।

তারপর মধুরতম যন্ত্রণা 'বিরহ'—প্রেমাস্পদের অভাবজনিত মহাদুঃখ। এই দুঃখ জগতে সকল দুঃখের মধ্যে মধুর—অতি মধুর। 'ভগবানকে লাভ করিতে পারিলাম না, জীবনে একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু পাইলাম না' বলিয়া মানুষ যখন অতিশয় ব্যাকুল হয় এবং সেজন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে ভক্তের বিরহ-অবস্থা। মনের এই অবস্থা হইলে প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না (ইতর-বিচিকিৎসা)। পার্থিব প্রেমেও মাঝে মাঝে উন্মত্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ দেখা যায়। নরনারীর পরস্পর-মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় হইলে তাহারা যাহাদিগকে ভালবাসে না, তাহাদের সান্নিধ্যে স্বভাবতই একটু বিরক্তি বোধ করে। এইরূপে যখন পরাভক্তি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে, তখন যে বস্তু বিষয় বা ব্যক্তি সাধক ভালবাসেন না, সেগুলি তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তখন ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয়েও কথা বলাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। 'তাঁহার বিষয়ে, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর।'[১] যাঁহারা শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বলেন, ভক্ত তাঁহাদিগকেই বন্ধু বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যাঁহারা অন্য বিষয়ে কথা বলেন, তাঁহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে হয়।

আরও এক উচ্চ অবস্থা আসে, যখন এই জীবনধারণও শুধু প্রেমাস্পদের জন্য। উহা ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও জীবনধারণ করা ভক্তের পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়। এই অবস্থার শাস্ত্রীয় নাম ''তদর্থপ্রাণস্থান'। আর সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবনধারণে সুখবোধ হয়। সংক্ষেপে—প্রিয়তমের চিন্তা আছে বলিয়াই জীবন তখন মধুর বলিয়া মনে হয়।

তদীয়তা—তাঁহার হইয়া যাওয়া; ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই 'তদীয়তা' আসে। যখন তিনি ভগবানের পাদস্পর্শ করিয়া ধন্য হন, তখন তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়, বিশুদ্ধ হইয়া যায়; তখন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি অনেক ভক্ত কেবল ঈশ্বরের

---

১ তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষঃ সেতুঃ।— মুণ্ডক উপ., ২।২।৫

উপাসনার জন্যই জীবন-ধারণ করেন। এই জীবনে ইহাই তাঁহাদের একমাত্র সুখ—এটি তাঁহারা ছাড়িতে চান না। 'হে রাজন্, হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে, যাঁহারা আত্মায় পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও ভগবানকে নিষ্কামভাবে ভক্তি করিয়া থাকেন।'[২] এই ভগবানকে দেবগণ, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদীরাও উপাসনা করিয়া থাকেন।'[১] যখন মানুষ নিজেকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে, তখন এই 'তদীয়তা'-অবস্থা লাভ হয়। সাধারণ ভালবাসাতেও যেমন প্রেমাস্পদের সকল জিনিসই প্রেমিকের চক্ষে অমূল্য বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ভক্তের নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই যে তাঁহার প্রেমাস্পদের। প্রিয়তমের এক টুকরা বস্ত্রও সে ভালবাসে; এরূপে যে ভগবানকে ভালবাসে, সে সমুদয় জগৎকেও ভালবাসে; কারণ সমুদয় জগৎই যে তাঁহার।

বিশ্বপ্রেম ও আত্মসমর্পণ

প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসিতে না শিখিলে কিরূপে ব্যষ্টিকে ভালবাসা যায়? ঈশ্বরই সমষ্টি। সমগ্র জগৎকে যদি এক অখণ্ডরূপে চিন্তা করা যায়, তাহাই ঈশ্বর; আর দৃশ্যমান জগৎ যখন পৃথক পৃথক রূপে দেখা যায়, তখনই উহা ব্যষ্টি। সমষ্টিকে, সেই সর্বব্যাপীকে—যে এক অখণ্ড ভাবের মধ্যে ক্ষুদ্রতর অখণ্ড ভাবসমূহ (unities) অবস্থিত, তাঁহাকে—ভালবাসিলেই সমগ্র জগৎকে ভালবাসা সম্ভব। ভারতীয় দার্শনিকগণ 'বিশেষ' (particular) লইয়াই ক্ষান্ত নন, তাঁহারা ব্যষ্টির দিকে ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং তারপরই ব্যষ্টি বা বিশেষ ভাবগুলি যে সামান্য ভাবের অন্তর্গত, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। সর্বভূতের মধ্যে এই 'সামান্য' (universal) ভাবের অন্বেষণই ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য। জ্ঞানীর লক্ষ্য—যাঁহাকে জানিলে সমুদয় জানা যায়, সেই সমষ্টিভূত, এক,

১ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৭।১০

২ যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।—নৃসিংহপূর্বতাপনী উপ., ২।৪

নিরপেক্ষ, সর্বভূতের মধ্যগত সামান্যভাবস্বরূপ পুরুষকে জানা। ভক্ত চান—যাঁহাকে ভালবাসিলে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভালবাসা জন্মে, সেই সর্বগত পুরুষপ্রধানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে; যোগীর আকাঙ্ক্ষা—সেই সকলের মূলীভূত শক্তিকে জয় করা, যাহাকে জয় করিলে সমুদয় জগৎ জয় করা যায়। ভারতবাসীর মনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ভক্তিতত্ত্ব, কি দর্শন—সব বিভাগেই উহা চিরকাল এই বহুর মধ্যে এক সর্বগত তত্ত্বের অপূর্ব অনুসন্ধানে নিয়োজিত।

ভক্ত ক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি একজনের পর আর একজনকে ভালবাসিতে থাক, তবে তুমি অনন্তকালের জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া যাইতে পার, কিন্তু সমগ্র জগৎকে মোটেই ভালবাসিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু অবশেষে যখন এই মূল সত্য অবগত হওয়া যায় যে, ঈশ্বর সমুদয় প্রেমের সমষ্টিস্বরূপ, মুক্ত মুমুক্ষু বদ্ধ—জগতের সকল জীবাত্মার সকল আকাঙ্ক্ষার সমষ্টিই ঈশ্বর, তখনই সাধকের পক্ষে সর্বজনীন প্রেম সম্ভব হইতে পারে। ভক্ত বলেনঃ ভগবান সমষ্টি এবং এই দৃশ্যমান জগৎ ভগবানের পরিচ্ছিন্ন ভাব—ভগবানের অভিব্যক্তি মাত্র। সমষ্টিকে ভালবাসিলে সমুদয় জগৎকেই ভালবাসা হইল। তখনই জগতের প্রতি ভালবাসা ও জগতের হিতসাধন—সবই সহজ হইবে। প্রথমে ভগবৎপ্রেমের দ্বারা আমাদিগকে এই শক্তিলাভ করিতে হইবে, নতুবা জগতের হিতসাধন করা সম্ভব হইবে না। ভক্ত বলেনঃ সবই তাঁহার, তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। এইরূপ ভক্তের নিকট ক্রমশঃ সবই পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, কারণ সবই তাঁহার। সকলেই তাঁহার সন্তান, তাঁহার অঙ্গস্বরূপ, তাঁহারই প্রকাশ। তখন কিভাবে অপরকে আঘাত করিতে পারি? কিরূপেই বা অপরকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারি? ভগবৎপ্রেম আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত ফলস্বরূপ সর্বভূতে প্রেম আসিবে। আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমুদয় বস্তুকে তাঁহার ভিতর দেখিতে পাই। যখন সাধক এই পরাভক্তিলাভে সমর্থ হন, তখন ঈশ্বরকে সর্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপে আমাদের হৃদয় প্রেমের এই প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। যখন আমরা এই প্রেমের আরও উচ্চস্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল পদার্থের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা একেবারে দূরীভূত হয়। মানুষকে তখন আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান বলিয়াই বোধ হয়; অপরাপর জীবজন্তুও আর জীবজন্তু বলিয়া বোধ হয় না, ঈশ্বর বলিয়াই বোধ হয়।

এমন কি, ব্যাঘ্রকেও ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ হয় না, ভগবানেরই এক প্রকাশ বলিয়া বোধ হইবে। এইরূপে 'এই প্রগাঢ় ভক্তির অবস্থায় সর্বপ্রাণীই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে। সর্বভূতে হরিকে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সকলকে অবিচলিত ভাবে ভালবাসেন।'[১]

এইরূপ প্রগাঢ় সর্বব্যাপক প্রেমের ফল পূর্ণ আত্মনিবেদন ও 'অপ্রাতিকূল্য' ; এ অবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সংসারে যাহা কিছু ঘটে, তাহার কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নয়। তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ—দুঃখ আসিলে বলিতে পারেন, 'স্বাগত দুঃখ' ; কষ্ট আসিলে বলিতে পারেন, 'এস কষ্ট, তুমিও আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ।' সর্প আসিলে সর্পকেও তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করিতে পারেন। মৃত্যু আসিলে এরূপ ভক্ত মৃত্যুকে সহাস্যে অভিনন্দন করিতে পারেন। 'ধন্য আমি, আমার নিকট ইহারা অসিতেছে, সকলেই স্বাগত।' ভগবান ও যাহা কিছু তাঁহার—সেই সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রসূত এই পূর্ণ নির্ভরতার অবস্থায় ভক্তের নিকট সুখ ও দুঃখের বিশেষ প্রভেদ থাকে না। তিনি তখন দুঃখকষ্টের জন্য আর অভিযোগ করেন না। আর প্রেমস্বরূপ ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা অবশ্যই মহাবীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপজনিত যশোরাশি অপেক্ষা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

অধিকাংশ মানুষের কাছে দেহই সর্বস্ব। দেহই তাহাদের নিকট সমগ্র বিশ্ব, দেহের সুখই তাহাদের চরম লক্ষ্য। এই দেহ ও দৈহিক ভোগ্যবস্তুকে উপাসনা করা-রূপ আসুরিক ভাব আমাদের সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। আমরা খুব লম্বা-চওড়া কথা বলিতে পারি, যুক্তির স্তরে খুব উচ্চে উড়িতে পারি, তথাপি আমরা শকুনির মতো ; যতই উচ্চে উঠিয়াছি মনে করি না কেন, আমাদের মন ভাগাড়ে গলিত শবের মাংসখণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট। জিজ্ঞাসা করিল আমাদের শরীরকে ব্যাঘ্রের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে কেন ? ব্যাঘ্রের ক্ষুধা নিবারণের জন্য আমরা এই শরীর তাহাকে দিতে পারি না কেন ? উহাতে তো ব্যাঘ্রের তৃপ্তি হইবে ; এই কার্যের সহিত আত্মোৎসর্গ ও উপাসনার কি খুব বেশি প্রভেদ ? অহংকে সম্পূর্ণরূপে নাশ করিতে পার না কি ? প্রেমধর্মের ইহা অতি উচ্চ চূড়া, আর অতি অল্প লোকই এই অবস্থা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যতদিন না মানুষ সর্বদা

---

১ এবং সর্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্বভূতময়ং হরিম্॥—বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৯।৯

এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত হয়, ততদিন সে পূর্ণ ভক্ত হইতে পারে না। আমরা সকলেই কমবেশি কিছু কালের জন্য শরীরটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি এবং অল্পাধিক স্বাস্থ্যসম্ভোগও করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি হইল? আমরা শরীরের যতই যত্ন লই না কেন, শরীর তো একদিন যাইবেই। ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। ধন্য তাহারা, যাহাদের শরীর অপরের সেবা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 'সাধু ব্যক্তি কেবল অপরের সেবার জন্য ধন, এমন-কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে সদা প্রস্তুত হইয়া থাকেন। এই জগতে মৃত্যুই একমাত্র সত্য—এখানে যদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কাজে না গিয়া ভাল কাজে যায়, তবে তাহা খুব ভাল বলিতে হইবে।'[1] আমরা কোনরূপে পঞ্চাশ—জোর একশ বছর বাঁচিতে পারি, কিন্তু তারপর?—মৃত্যু। যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়; এমন সময় আসিবে, যখন উহা বিশ্লিষ্ট হইবেই হইবে। ঈশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, জগতের বড় বড় মহাপুরুষ এবং আচার্যেরা সকলেই এই পথে গিয়াছেন।

ভক্ত বলেন—এই ক্ষণস্থায়ী জগতে, যেখানে সবই ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে, এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই, সেটুকুরই সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। আর বাস্তবিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার—জীবনকে সর্বভূতের সেবায় নিযুক্ত করা। ভয়ানক দেহবুদ্ধিই জগতে সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার মূল। আমাদের মহাভ্রম ঃ এই শরীরটি আমি; যে কোন প্রকারে হউক, উহাকে রক্ষা করিতে হইবে ও উহার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে হইবে। এই ভাবই আমাদের পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে দেয় না। যদি নিশ্চিত ভাবে জান যে, তুমি শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহার সহিত তোমার বিরোধ উপস্থিত হইবে; তখন তুমি সর্বপ্রকার স্বার্থপরতার অতীত হইয়া গেলে। এইজন্য ভক্ত বলেন, 'আমাদিগকে জগতের সকল পদার্থ সম্পর্কে মৃতবৎ থাকিতে হইবে'; এবং ইহাই বাস্তবিক আত্মসমর্পণ—শরণাগতি। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক'—এই বাক্যের অর্থই ঐ আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি। স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে করা—ভগবানের ইচ্ছাতেই আমাদের দুর্বলতা ও সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়া থাকে, ইহা নির্ভরতা নয়। হইতে পারে, আমাদের স্বার্থপূর্ণ কার্যাদি

---

১ ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি ॥—হিতোপদেশ

হইতেও ভবিষ্যতে আমাদের মঙ্গল হয়, কিন্তু তাহা ভগবান দেখিবেন, তাহাতে তোমার আমার কিছু করিবার নাই। প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্য কখনো কিছু ইচ্ছা করেন না বা কোন কার্য করেন না। 'প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করে, তোমার নামে কত দান করে। আমি দরিদ্র, আমার কিছু নাই, তাই আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। প্রভু, আমায় ত্যাগ করিও না।'—ইহাই ভক্তহৃদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে উত্থিত প্রার্থনা। যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার নিকট প্রিয়তম প্রভুর চরণে এই আত্মসমর্পণ—জগতের সমুদয় ধন, প্রভুত্ব, এমন-কি মানুষ যতদূর মান যশ ও ভোগ-সুখের আশা করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। ভগবানে নির্ভরজনিত 'এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত' ও অমূল্য। আত্মসমর্পণ হইতে এই 'অপ্রাতিকূল্য'-অবস্থা লাভ হইলে সাধকের আর কোনরূপ স্বার্থ থাকে না; আর স্বার্থই যখন নাই, তখন আর তাঁহার স্বার্থহানিকর বস্তু জগতে কি থাকিতে পারে? এই পরম নির্ভরের অবস্থায় সর্বপ্রকার আসক্তি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, কেবল সেই সর্বভূতের অন্তরাত্মা ও আধারস্বরূপ ভগবানের প্রতি সর্বাবগাহী ভালবাসা অবশিষ্ট থাকে। ভগবানের প্রতি এই আসক্তি জীবাত্মার বন্ধনের কারণ নয়, বরং উহা নিঃশেষে তাহার সর্ব বন্ধন মোচন করে।

পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি এক

উপনিষদ্ পরা ও অপরা নামক দুইটি বিদ্যা পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; আর ভক্তের নিকটে এই পরাবিদ্যা ও পরাভক্তিতে বাস্তবিক কিছু প্রভেদ নাই। মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে, 'ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন, জানিবার যোগ্য দুই প্রকার বিদ্যা—পরা ও অপরা। উহার মধ্যে অপরা বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চারণ যতি ইত্যাদির বিদ্যা, কল্প অর্থাৎ যজ্ঞপদ্ধতি, ব্যাকরণ, নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি ও তাহাদের অর্থ যে শাস্ত্রের

দ্বারা জানা যায়, এবং ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। আর পরাবিদ্যা তাহাই, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে জানিতে পারা যায়।'[১]

সুতরাং স্পষ্ট দেখা গেল যে, এই পরাবিদ্যাই ব্রহ্মজ্ঞান। দেবীভাগবতে পরাভক্তির এই লক্ষণগুলি পাইঃ তৈল যেমন এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিবার সময় অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তেমনি মন যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবানকে স্মরণ করিতে থাকে, তখনই পরাভক্তির উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।[২] অবিচ্ছিন্ন অনুরাগের সহিত ভগবানের দিকে হৃদয় ও মনের এরূপ অবিরত ও নিত্য স্থিরতাই মানবহৃদয়ে সর্বোচ্চ ভগবৎ-প্রেমের প্রকাশ। আর সকল প্রকার ভক্তি কেবল এই পরাভক্তির—'রাগানুগা' ভক্তির সোপানমাত্র। যখন সাধকের হৃদয়ে পরানুরাগের উদয় হয়, তখন তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করিবে, আর কিছুই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। তিনি নিজ মনে তখন ভগবানের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিবেন না। তাঁহার আত্মা সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া মনোজগতের ও জড়জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সর্বপ্রকার বন্ধন অতিক্রম করিয়া শান্ত ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। এরূপ লোকই কেবল ভগবানকে নিজ হৃদয়ে উপাসনা করিতে সমর্থ। তাঁহার নিকটে অনুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রতীক ও প্রতিমা, শাস্ত্রাদি ও মতামত সবই অনাবশ্যক হইয়া পড়ে—উহাদের দ্বারা তাঁহার আর কোন উপকার হয় না। ভগবানকে এরূপভাবে ভালবাসা বড় সহজ নয়।

সাধারণ মানবীয় ভালবাসা যেখানে প্রতিদান পায়, সেখানেই বৃদ্ধি পায়; যেখানে প্রতিদান না পায়, সেখানে উদাসীনতা আসিয়া ভালবাসার স্থান অধিকার করে। নিতান্ত অল্প ক্ষেত্রেই কিন্তু কোনরূপ প্রতিদান না পাইলেও প্রেমের বিকাশ দেখা যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা অগ্নির প্রতি পতঙ্গের ভালবাসার সহিত ইহার তুলনা করিতে পারি। পতঙ্গ আগুনকে ভালবাসে, আর উহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পতঙ্গের স্বভাবই এইভাবে অগ্নিকে ভালবাসা। জগতে যত প্রকার প্রেম দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কেবল প্রেমের জন্যই যে প্রেম, তাহাই সর্বোচ্চ ও পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রেম। এইরূপ প্রেম আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে কার্য করিতে আরম্ভ করিলেই পরাভক্তিতে লইয়া যায়।

১ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।—মুণ্ডক উপ, ১।১।৪-৫

২ চেতসো বর্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা।—দেবীভাগবত, ৭।৩৭।১২

প্রেম ত্রিকোণাত্মক

প্রেমকে আমরা একটি ত্রিকোণ-রূপে প্রকাশ করিতে পারি, উহার কোণগুলিই যেন উহার তিনটি অবিভাজ্য বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক। তিনটি কোণ ব্যতীত একটি ত্রিকোণ বা ত্রিভুজ সম্ভব নয়, আর এই তিনটি লক্ষণ ব্যতীত প্রকৃত প্রেমও সম্ভব নয়। প্রেম-রূপ এই ত্রিকোণের একটি কোণঃ প্রেমে কোন দর-কষাকষি বা কেনা-বেচার ভাব নাই। যেখানে কোন প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়; সে-ক্ষেত্রে উহা কেবল দোকানদারিতে পরিণত হয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের ভগবানের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পালনের জন্য তাঁহার নিকট কোন না কোন অনুগ্রহপ্রাপ্তির ভাব থাকে, ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম থাকিতে পারে না। ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় যাহারা উপাসনা করে, তাহারা ঐ অনুগ্রহ-প্রাপ্তির আশা না থাকিলে তাঁহাকে উপাসনা করিবে না। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন—তিনি প্রেমাস্পদ বলিয়া, প্রকৃত ভক্তের এই দিব্য ভাবাবেগের আর কোন হেতু নাই।

কথিত আছে, কোন এক সময়ে এক বনে এক রাজার সহিত জনৈক সাধুর সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়াই তাঁহার পবিত্রতা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পরিশেষে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, 'আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্য আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে।' সাধু কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন ও বলিলেন, 'বনের ফল আমার প্রচুর আহার, পর্বত-নিঃসৃত পবিত্র সরিৎ আমার পর্যাপ্ত পানীয়, বৃক্ষত্বক্, আমার পর্যাপ্ত পরিধেয় এবং গিরিগুহা আমার যথেষ্ট বাসস্থান। কেন আমি তোমার কিংবা অপরের নিকট কিছু লইব?' রাজা বলিলেন, 'আমাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য আমার সহিত রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে চলুন এবং আমার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করুন।' অনেক অনুনয়ের পর তিনি অবশেষে রাজার সহিত যাইতে স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সহিত প্রাসাদে গেলেন। দান করিবার পূর্বে রাজা পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেনঃ হে ভগবান, আমাকে আরও

সন্তান-সন্ততি দাও, আরও ধন দাও, আরও রাজ্য দাও, আমার শরীর নীরোগ কর ইত্যাদি। রাজার প্রার্থনা শেষ হইবার পূর্বেই সাধু নীরবে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া রাজা হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে করিতে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আমার দান গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া গেলেন?' সাধু তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ভিক্ষুকের কাছে আমি ভিক্ষা করি না। তুমি নিজে তো একজন ভিক্ষুক; তুমি আবার কিভাবে আমাকে কিছু দিতে পার? আমি এত মূর্খ নই যে, ভিক্ষুকের নিকট দান গ্রহণ করিব। যাও, আমার অনুসরণ করিও না!'

এই গল্পটিতে ধর্মরাজ্যে ভিক্ষুক আর ভগবানের প্রকৃত ভক্তদের ভিতর বেশ প্রভেদ দেখানো হইয়াছে। কোন বরলাভের জন্য, এমন কি মুক্তিলাভের জন্যও ভগবানের উপাসনা করা অধম উপাসনা। প্রেম কোন পুরস্কার চায় না, প্রেম সর্বদা প্রেমেরই জন্য। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন, কারণ তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। দৃষ্টান্তঃ তুমি একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া উহা ভালবাসিয়া ফেলিলে; তুমি ঐ দৃশ্যের নিকট হইতে কোনরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা কর না, আর সেই দৃশ্যও তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করে না; তথাপি উহা দর্শন করিয়া তোমার মনে আনন্দের উদয় হয়—উহা তোমার মনের অশান্তি দূর করিয়া দেয়, উহা তোমাকে শান্ত করিয়া দেয়, তোমাকে ক্ষণকালের জন্য একরূপ মর্ত স্বভাবের ঊর্ধ্বে লইয়া যায় এবং এক স্বর্গীয় আনন্দে মনকে শান্ত করিয়া দেয়। ইহাই প্রকৃত প্রেমের ভাব, এবং এই বৈশিষ্ট্যই উক্ত ত্রিকোণাত্মক প্রেমের একটি কোণ। অতএব প্রেমের পরিবর্তে কিছু চাহিও না, সর্বদা দাতার আসন গ্রহণ কর। ভগবানকে তোমার প্রেম নিবেদন কর, পরিবর্তে তাঁহার নিকট কিছু চাহিও না।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণঃ প্রেমে কোনরূপ ভয় নাই। যাহারা ভয়ে ভগবানকে ভালবাসে, তাহারা মনুষ্যাধম; তাহাদের মনুষ্যভাবই এখনো পূর্ণ বিকশিত হয় নাই। তাহারা শাস্তির ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে। তাহারা মনে করে, ভগবান এক বিরাট পুরুষ, তাঁহার এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে চাবুক; তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিলে তাহারা দণ্ডিত হইবে। ভগবানকে দণ্ডের ভয়ে উপাসনা করা অতি নিম্নশ্রেণীর উপাসনা। এইরূপ উপাসনাকে যদি উপাসনাই বলিতে হয়, তবে উহা অতি অপরিণত ভাবেরই উপাসনা। যতদিন হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে, ততদিন সেখানে ভালবাসাও থাকিবে কি করিয়া? প্রেম স্বভাবতই সমুদয় ভয়কে জয় করিয়া ফেলে। কল্পনা কর, এক তরুণী জননী পথে চলিয়াছেন;

একটি কুকুর ডাকিলেই তিনি ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি নিকটতম কোন গৃহে প্রবেশ করেন। কিন্তু যদি তাঁহার শিশু তাঁহার সঙ্গে থাকে এবং যদি একটি সিংহ শিশুটির উপর লাফাইয়া পড়ে, তখন সেই জননী কোথায় থাকিবেন?—সিংহের মুখে। শিশুটিকে বাঁচাইবার জন্য অবশ্যই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। ভালবাসা সর্ববিধ ভয়কে জয় করে। আমি জগৎ হইতে পৃথক—এই প্রকার একটি স্বার্থপর ভাব হইতেই ভয় জন্মে। মনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আমি নিজেকে যত স্বার্থপর করিয়া ফেলিব, আমার ভয়ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। যদি কেহ মনে করে, সে কোন কাজের নয়, নিশ্চয়ই সে ভয়ে অভিভূত হইবে। আর নিজেকে যতই তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বলিয়া না ভাবিবে, ততই তোমার ভয় কমিয়া যাইবে। যতদিন তোমার একবিন্দু ভয় আছে ততদিন তোমার মধ্যে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম ও ভয় দুইটি একত্র থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাকে ভয় করিবেন না। 'ভগবানের নাম বৃথা লইও না'—এই আদেশ শুনিয়া প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক হাসিয়া উঠেন। প্রেমের ধর্মে ভগবন্নিন্দা কোথায়? যেরূপেই হউক, প্রভুর নাম যত লইতে পার, ততই মঙ্গল। প্রকৃত ভক্ত তাঁহাকে ভালবাসে, তাই তো তাঁহার নাম করে।

প্রেমরূপ ত্রিকোণের তৃতীয় কোণঃ প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান নাই। প্রেমের আর দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকিবে না, কারণ প্রেমেই প্রেমিকের সর্বোচ্চ আদর্শ রূপায়িত। যতদিন না ভালবাসার পাত্র আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, ততদিন প্রকৃত প্রেম সম্ভব নয়। হইতে পারে, অনেক স্থলে মানুষের ভালবাসা ভুল পথে চালিত হয়, অপাত্রে অর্পিত হয়, কিন্তু প্রেমিকের পক্ষে তাহার প্রেমাস্পদ সর্বদা তাহার সর্বোচ্চ আদর্শ। একজন হয়তো জঘন্যতম ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছে, আর একজন—মহত্তম এক ব্যক্তিকে ভালবাসিতেছে, তা সত্ত্বেও উভয়ত্র নিজ আদর্শকেই ভালবাসা হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই 'ঈশ্বর' বলা হয়। অজ্ঞ বা জ্ঞানী, সাধু বা পাপী, নর বা নারী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত—সকলেরই উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর। সমুদয় সৌন্দর্য, মহত্ত্ব ও শক্তির উচ্চতম আদর্শসমূহ সমন্বিত করিলেই প্রেমময় ও প্রেমাস্পদ ভগবানের পূর্ণতম ভাব পাওয়া যায়।

এই আদর্শগুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কোন না কোনরূপে স্বভাবতই বর্তমান। উহারা যেন আমাদেরই মনের অঙ্গ বা অংশবিশেষ। মানবপ্রকৃতিতে যে-সকল ক্রিয়ার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলি সবই আদর্শকে ব্যবহারিক জীবনে

পরিণত করিবার চেষ্টা। আমরা আমাদের চতুর্দিকে সমাজে যে নানাবিধ কর্মের প্রকাশ ও আন্দোলন দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন আত্মার বিভিন্ন আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টার ফলমাত্র। ভিতরে যাহা আছে, তাহাই বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। মানবহৃদয়ে আদর্শের এই চিরপ্রবল প্রভাবই একমাত্র প্রেরণাশক্তি, যাহা মানবজাতির মধ্যে সতত ক্রিয়াশীল। হইতে পারে, শত শত জন্মের পর, সহস্র সহস্র বৎসর চেষ্টার পর মানুষ বুঝিতে পারে—আমাদের অন্তরের আদর্শ অনুযায়ী বাহিরকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা বা বাহিরের অবস্থাসমূহের সহিত ভিতরের আদর্শকে সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইবার চেষ্টা বৃথা। এইটি বুঝিতে পারিলে সাধক বহির্জগতে নিজের আদর্শ প্রক্ষেপ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সেই উচ্চতম প্রেমের ভূমি হইতে আদর্শকেই আদর্শরূপে উপাসনা করে। সমুদয় নিম্নস্তরের আদর্শগুলি এই পূর্ণ আদর্শের অন্তর্গত।

সকলেই ঐ কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, কুরূপার মধ্যেও প্রেমিক হেলেনের সৌন্দর্য দেখিয়া থাকেন। বাহিরের লোক বলিতে পারে, প্রেম অপাত্রে প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু প্রেমিক কুরূপা দেখেন না, তিনি তাঁহার হেলেনকেই দেখিয়া থাকেন। সুন্দর বা কুৎসিত যাহাই হউক, প্রেমের আধার প্রকৃতপক্ষে যেন একটি কেন্দ্র, তাহার চারিদিকে আমাদের আদর্শগুলি রূপায়িত হয়। সাধারণতঃ মানুষ কিসের উপাসনা করে?—অবশ্য শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও প্রেমিকের সর্বাবগাহী পূর্ণ ভাবাদর্শের উপাসনা নয়। নরনারীগণ সাধারণতঃ নিজ নিজ অন্তরের আদর্শকেই উপাসনা করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শকে বাহিরে আনিয়া তাহারই সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে। তাই তো আমরা দেখিতে পাই, যাহারা নিজেরা নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু, তাহারা এক রক্তপিপাসু ঈশ্বর কল্পনা করে, কারণ তাহারা কেবল নিজ নিজ ভাবের উচ্চতম আদর্শকেই ভালবাসিতে পারে। এইজন্যই সদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরের আদর্শ অতি উচ্চ, তাঁহার আদর্শ অপর ব্যক্তির আদর্শ হইতে অত্যন্ত পৃথক।

প্রেমের ভগবানের প্রমাণ তিনিই

যে প্রেমিক ব্যক্তি স্বার্থপরতা, লাভের আকাঙ্ক্ষা ও পরিবর্ত-ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাঁহার কোন ভয় নাই, তাঁহার আদর্শ কি? মহামহিমময় ঈশ্বরকেও তিনি বলিবেন, "আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়াছি, আমার নিজের বলিতে আর কিছু নাই, তথাপি তোমার নিকট হইতে আমি কিছুই চাই না। বাস্তবিক এমন কিছুই নাই, যাহা আমি 'আমার' বলিতে পারি।" সাধক যখন এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করেন, তখন তাঁহার আদর্শ প্রেমজনিত পূর্ণ নির্ভীকতার আদর্শে পরিণত হয়। এই প্রকার সাধকের সর্বোচ্চ আদর্শে কোন প্রকার 'বিশেষত্ব'রূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে না। উহা সার্বভৌম প্রেম, অনন্ত ও অসীম প্রেম, উহাই প্রেমস্বরূপ। প্রেমের এই মহান আদর্শকে তখন সেই সাধক কোনরূপ প্রতীক বা প্রতিমার সহায়তা না লইয়াই উপাসনা করেন। এই সর্বাবগাহী প্রেমকে 'ইষ্ট' বলিয়া উপাসনা করাই পরাভক্তি। অন্য সকল প্রকার ভক্তি কেবল উহা লাভের সোপানমাত্র।

এই প্রেমধর্ম অনুসরণ করিতে করিতে আমরা যে সফলতা বা বিফলতার সম্মুখীন হই, সে-সব এই আদর্শলাভের পথেই ঘটে। অন্তরে একটির পর একটি বস্তু গৃহীত হয় এবং আমাদের আদর্শ উহার উপর একে একে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই সমুদয় বাহ্যবস্তুই ক্রমবিস্তারশীল সেই অভ্যন্তরীণ আদর্শকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়, এবং ভক্ত স্বভাবতই একটির পর একটি আদর্শ পরিত্যাগ করেন। অবশেষে সাধক বুঝিতে থাকেন, বাহ্যবস্তুতে আদর্শ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা বৃথা, আদর্শের সহিত তুলনায় সকল বাহ্যবস্তুই অতি তুচ্ছ। কালক্রমে তিনি সেই সর্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ প্রেম লাভ করেন। উহা তাঁহার অন্তরে জীবন্ত ও সত্যস্বরূপে অনুভূত হয়। যখন ভক্ত এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন 'ভগবানকে প্রমাণ করা যায় কি না? ভগবান সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান কি না?'—এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার আর ইচ্ছাই হয় না। তাঁহার নিকট ভগবান প্রেমময়, প্রেমের সর্বোচ্চ আদর্শ এবং এই ভাবই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রেমরূপ বলিয়া ঈশ্বর স্বতঃসিদ্ধ, অন্যপ্রমাণ-নিরপেক্ষ। প্রেমিকের নিকট প্রেমময়ের অস্তিত্ব-প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। শাসক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অন্যান্য ধর্মের অনেক যুক্তি আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ভক্ত এরূপ ঈশ্বরের চিন্তা করেন না বা করিতে পারেন না। এখন তাঁহার নিকট ভগবান কেবল প্রেমস্বরূপে বর্তমান। সকলের অন্তর্যামীরূপে তাঁহাকে অনুভব করিয়া ভক্ত আনন্দে বলিয়া উঠেন, 'কেহই পতির জন্য পতিকে ভালবাসে না, পতির অন্তর্যামী আত্মার জন্যই পতিকে ভালবাসে। কেহই পত্নীর জন্য পত্নীকে ভালবাসে না, পত্নীর অন্তর্যামী আত্মার জন্যই পত্নীকে ভালবাসে।'

কেহ কেহ বলেন, স্বার্থপরতাই মানুষের সর্বপ্রকার কর্মের মূল। উহাও প্রেম, তবে (কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ হইয়া) 'বিশেষ' ভাবাপন্ন হওয়ায় উহা নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে মাত্র। যখন আমি নিজেকে জগতের সকল বস্তুতে অবস্থিত ভাবি, যখন আমার প্রেম বিশ্বব্যাপী হয় এবং আমাতে স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি ভ্রমবশতঃ নিজেকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র প্রাণী মনে করি, তখন আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ ও 'বিশেষ' ভাব ধারণ করে। প্রেমের বিষয়কে সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করায় আমাদের ভ্রম দৃঢ় হইয়া যায়। এই জগতের সকল বস্তুই ঈশ্বর-প্রসূত, সুতরাং ভালবাসার যোগ্য। কিন্তু ইহা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সমষ্টিকে ভালবাসিলে অংশগুলিকেও ভালবাসা হইল। এই সমষ্টিই—প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত ভক্তগণের ভগবান। ঈশ্বর-বিষয়ক অন্যান্য ভাব যথা—স্বর্গস্থ পিতা, শাস্তা, স্রষ্টা, নানাবিধ মতামত, শাস্ত্র প্রভৃতি এরূপ ভক্তের নিকট নিরর্থক; তাঁহাদের নিকট এ-সবের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ পরাভক্তির প্রভাবে তাঁহারা একেবারে এই-সকলের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন।

যখন অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র এবং ঐশ্বরিক প্রেমামৃতে পরিপূর্ণ হয়, তখন 'ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ'—এই ভাব ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য সর্বপ্রকার ধারণা বালকোচিত ও অসম্পূর্ণ বা অনুপযুক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক পরাভক্তির প্রভাবই এইরূপ। তখন সে সিদ্ধ ভক্ত তাঁহার ভগবানকে মন্দিরে বা গির্জায় দর্শন করিতে যান না; তিনি এমন স্থানই দেখিতে পান না—যেখানে ভগবান নাই। তিনি তাঁহাকে মন্দিরের ভিতরে দেখিতে পান, বাহিরেও দেখিতে পান, সাধুর সাধুতায় দেখিতে পান, পাপীর পাপেও দেখিতে পান, কারণ তিনি যে পূর্বেই তাঁহাকে

নিত্যদীপ্তিমান ও নিত্যবর্তমান এক সর্বশক্তিমান অনির্বাণ প্রেমজ্যোতিরূপে নিজ হৃদয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মানবীয় ভাষায় ভগবৎ-প্রেমের বর্ণনা

মানবীয় ভাষায় প্রেমের এই সর্বোচ্চ আদর্শ প্রকাশ করা অসম্ভব। উচ্চতম মানব-কল্পনাও উহার অনন্ত পূর্ণতা ও সৌন্দর্য অনুভব করিতে অক্ষম। তথাপি সর্বদেশের নিম্ন ও উচ্চ ভাবের প্রেমধর্মের সাধকগণকে তাঁহাদের প্রেমের আদর্শ বুঝিতে ও বুঝাইতে চিরকালই এই অনুপযোগী মানবীয় ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, বিভিন্ন প্রকারের মানবীয় প্রেমই এই অব্যক্ত ভগবৎ-প্রেমের প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে। মানব ঐশ্বরিক বিষয়সমূহ নিজের মানবীয় ভাবেই চিন্তা করিতে পারে, এবং সেই পূর্ণ কেবল আমাদের আপেক্ষিক ভাষাতেই আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন। সমুদয় জগৎ আমাদের নিকট যেন সীমার ভাষায় লেখা অসীমের কথা। এই কারণেই ভক্তেরা ভগবান ও তাঁহার উপাসনা-বিষয়ে লৌকিক প্রেমের লৌকিক ভাষা ও শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পরাভক্তির কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা এই দিব্যপ্রেম বিভিন্ন উপায়ে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থাকে 'শান্ত ভক্তি' বলে। যখন মানুষের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই, বাহ্য অনুষ্ঠানমূলক প্রতীকোপাসনা অপেক্ষা একটু উন্নত সাধারণ শান্ত ভালবাসার উদয় হইয়াছে মাত্র, উহাতে তীব্রবেগসম্পন্ন প্রেমের উন্মত্ততা মোটেই নাই, তখন ঐ ভাবকে 'শান্ত ভক্তি' বলে। দেখিতে পাই, জগতে কতক লোক আছেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে ভালবাসেন, আর কিছু লোক আছেন, তাঁহারা ঝড়ের মতো বেগে চলিয়া যান। 'শান্ত ভক্ত' ধীর শান্ত নম্র। তদপেক্ষা একটু উচ্চতর ভাব—'দাস্য'; এ অবস্থায় মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের দাস ভাবে। বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই তাঁহার আদর্শ।

তারপর 'সখ্য-প্রেম'—এই সখ্য-প্রেমের সাধক ভগবানকে বলিয়া থাকেন,

'তুমি আমার প্রাণের সখা।'[১] এরূপ ভক্ত ভগবানের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করে, যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট নিজের হৃদয় খোলে, এবং জানে—বন্ধু তাহার দোষের জন্য তাহাকে কখনই তিরস্কার করিবে না, বরং সর্বদাই সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে যেমন একটা সমান সমান ভাব থাকে, সেইরূপ সখ্য-প্রেমের সাধক ও তাঁহার সখারূপ ভগবানের মধ্যে একটা সমভাবের আদানপ্রদান চলিতে থাকে। সুতরাং ভগবান আমাদের হৃদয়ের অতি সন্নিহিত বন্ধু হইলেন—সেই বন্ধুর নিকট আমরা আমাদের জীবনের সব কথা খুলিয়া বলিতে পারি। আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গুপ্তভাবগুলি তাঁহার নিকট জানাইতে পারি। সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, তিনি যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই করিবেন। এই ভাবিয়া আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানকে তাঁহার সমান মনে করেন। ভগবান যেন আমাদের খেলার সাথী, আমরা সকলে যেন এই জগতে খেলা করিতেছি। ছেলেরা যেমন খেলা করে, মহামহিমান্বিত রাজা-মহারাজগণও যেমন নিজ নিজ খেলা খেলিয়া যান, সেইরূপ প্রেমময় ভগবানও নিজে জগতের সহিত খেলা করিতেছেন। তিনি পূর্ণ, তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তাঁহার সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? আমরা কার্য করি, তাহার উদ্দেশ্য কোন অভাবপূরণ, আর অভাব বলিতেই অসম্পূর্ণতা বুঝায়। ভগবান পূর্ণ, তাঁহার কোন অভাব নাই। কেন তিনি এই নিয়ত কর্মময় সৃষ্টি লইয়া ব্যস্ত থাকেন? তাঁহার উদ্দেশ্য কি? ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য-বিষয়ে আমরা যে-সকল উপন্যাস কল্পনা করি, সেগুলি গল্প-হিসাবে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ঐগুলির অন্য কোন মূল্য নাই। বাস্তবিক সবই তাঁহার লীলা বা খেলা। এই জগৎ তাঁহার খেলা—ক্রমাগত এই খেলা চলিতেছে। তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎ নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত একটি মজার খেলামাত্র। যদি তুমি দরিদ্র হও, তবে দারিদ্র্যকেই একটি কৌতুক বলিয়া উপভোগ কর; যদি ধনী হও, তবে ঐ অবস্থাও আর একটি তামাসারূপে সম্ভোগ কর। বিপদ আসে তো বেশ মজা, আবার সুখ আসিলে মনে করিতে হইবে, এ আরও ভাল মজা। সংসার একটি ক্রীড়াক্ষেত্র—আমরা এখানে বেশ নানারূপ কৌতুক উপভোগ করিতেছি—যেন খেলা হইতেছে, আর ভগবান আমাদের সহিত সর্বদাই খেলা করিতেছেন, আমরাও তাঁহার সহিত খেলিতেছি। ভগবান আমাদের অনন্তকালের খেলার সাথী, কেমন সুন্দর খেলা খেলিতেছেন!

---

১ ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।—পাণ্ডবগীতা

খেলা সাঙ্গ হইল—এক যুগ শেষ হইল। তারপর অল্পাধিক সময়ের জন্য বিশ্রাম—তারপর আবার খেলা আরম্ভ—আবার জগতের সৃষ্টি। যখন ভুলিয়া যাও সবই খেলা, আর তুমিও এ খেলার সহায়ক, তখনই—কেবল তখনই দুঃখকষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়; তখনই হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, আর সংসার তোমার উপর প্রচণ্ড শক্তিতে চাপিয়া বসে। কিন্তু যখনই তুমি এই দু-দণ্ড জীবনের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীতে সত্যবুদ্ধি ত্যাগ কর, আর যখন সংসারকে লীলাভূমি ও নিজদিগকে তাঁহার লীলাসহায়ক বলিয়া মনে কর, তখনই তোমার দুঃখ চলিয়া যাইবে। প্রতি অণুতে তিনি খেলা করিতেছেন। তিনি খেলা করিতে করিতে পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছেন। তিনি মনুষ্য হৃদয়, প্রাণী ও উদ্ভিদ-সমুহের সহিত খেলা করিতেছেন। আমরা যেন তাঁহার হাতে দাবাবোড়ের ঘুঁটি, একটি ছকে বসাইয়া তিনি যেন সেগুলি চালিতেছেন। তিনি আমাদিগকে প্রথমে একদিকে, পরে অপরদিকে সাজাইতেছেন—আমরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহারই খেলার সহায়ক। কি আনন্দ, আমরা তাঁহার খেলার সহায়ক।

পরবর্তী ভাবকে 'বাৎসল্য' বলে। উহাতে ভগবানকে পিতা না ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটি কিছু নূতন রকমের বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হইতে ঐশ্বর্যের ভাবগুলি দূর করা। ঐশ্বর্য-ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে। ভালবাসায় কিন্তু ভয় থাকা ঠিক নয়। চরিত্র-গঠনের জন্য ভক্তি ও আজ্ঞাবহতা অভ্যাস করা আবশ্যক বটে, কিন্তু একবার চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে প্রেমিক যখন শান্ত-প্রেমের একটু আস্বাদ পান, আবার প্রেমের তীব্র উন্মত্ততাও কিছু আস্বাদ করেন, তখন তাঁহার আর নীতিশাস্ত্র, বিধিনিয়ম প্রভৃতির কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। ভক্ত বলেন, আমি ভগবানকে মহামহিম, ঐশ্বর্যশালী, জগদীশ্বর দেবদেব-রূপে ভাবিতে চাই না। ভগবানের ধারণা হইতে এই ভয়োৎপাদক ঐশ্বর্যভাব দূর করিবার জন্য তিনি ভগবানকে নিজ শিশুসন্তান-রূপে ভালবাসেন। মাতাপিতা সন্তানকে ভয় করেন না, তাহার প্রতি তাঁহাদের ভক্তিও হয় না। সন্তানের কাছে তাঁহাদের প্রার্থনা করিবারও কিছু থাকে না। সন্তান সর্বদাই গ্রহীতা, সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্য মাতাপিতা শত শতবার শরীর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের একটি সন্তানের জন্য তাঁহারা সহস্র জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। এই ভাব হইতে ভগবানকে বাৎসল্যভাবে ভালবাসা হয়। যে-সকল ধর্মসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, ভগবান নরদেহে অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের মধ্যেই এই বাৎসল্যভাবে উপাসনা স্বাভাবিক। মুসলমানদের পক্ষে

ভগবানকে বাৎসল্যভাবে উপাসনা করা অসম্ভব, তাঁহারা ভয়ে এ ভাব হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন। কিন্তু খ্রীস্টান ও হিন্দু সহজেই ইহা বুঝিতে পারেন, কারণ তাঁহাদের মাতৃক্রোড়ে যীশু ও কৃষ্ণের শিশুমূর্তি রহিয়াছে। ভারতীয় নারীগণ অনেক সময় নিজদিগকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলিয়া চিন্তা করেন; খ্রীস্টান জননীগণও নিজদিগকে খ্রীস্টের মাতা বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন। ইহা হইতে পাশ্চাত্যের লোকেরা ঈশ্বরের মাতৃভাব সম্বন্ধেও জানিতে পারিবেন; আর ইহা তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন। ভগবানের প্রতি ভয়ভক্তিরূপ কুসংস্কার আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে দৃঢ়মূল হইয়া আছে। এই ভয়মিশ্রিত ভক্তি, ঐশ্বর্য ও মহিমার ভাব প্রেমে একেবারে নিমজ্জিত করিয়া দিতে অনেক দিন লাগে।

মানবীয় ভাবের আর একটি রূপে ভগবৎ-প্রেমের আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার নাম 'মধুর' ভাব, সর্বপ্রকার ভাবের মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ। এ সংসারে প্রকাশিত সর্বোচ্চ প্রেমের উপর উহার ভিত্তি—আর মানবীয় অভিজ্ঞতায় যত প্রকার প্রেম আছে, তাহার মধ্যে উহাই উচ্চতম ও প্রবলতম। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম যেরূপ মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে উলটপালট করিয়া দেয়, আর কোন প্রেম সেরূপ করিতে পারে? কোন্ প্রেম মানুষের প্রতিটি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে?—তাহার নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়?—মানুষকে হয় দেবতা, নয় পশু করিয়া ফেলে? দিব্যপ্রেমের এই মধুরভাবে ভগবান আমাদের পতি। আমরা সকলে স্ত্রী বা প্রকৃতি, জগতে পুরুষ আর কেহ নাই। একমাত্র পুরুষ আছেন—তিনিই, আমাদের সেই প্রেমাস্পদই একমাত্র পুরুষ। পুরুষ নারীকে এবং নারী পুরুষকে যে ভালবাসা দিয়া থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে হইবে।

আমরা জগতে যত প্রকার প্রেম দেখিতে পাই, যাহা লইয়া আমরা অল্পাধিক পরিমাণে খেলাই করিতেছি, ভগবানই সেগুলির একমাত্র লক্ষ্য। তবে দুঃখের বিষয়, যে অনন্ত সমুদ্রে এই প্রেমের প্রবল স্রোতস্বতী অবিরতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, মানব তাহা জানে না; সুতরাং নির্বোধের ন্যায় সে মানুষরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। মানবপ্রকৃতিতে সন্তানের প্রতি যে প্রবল স্নেহ দেখা যায়, তাহা কেবল একটি সন্তানরূপ ক্ষুদ্র পুতুলের জন্য নয়; যদি তুমি অন্ধভাবে ঐ একটিমাত্র সন্তানের উপরই উহা প্রয়োগ কর, তবে সেজন্য তোমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু ঐ কষ্টভোগ হইতেই তোমার এই বোধ আসিবে, তোমার ভিতরে যে-প্রেম আছে, তাহা যদি কোন মনুষ্যে প্রয়োগ কর,

তবে শীঘ্র হউক বা বিলম্বেই হউক, মনে দুঃখ ও বেদনা পাইবে। অতএব আমাদের প্রেম সেই পুরুষোত্তমকেই দিতে হইবে—যাঁহার বিনাশ নাই, যাঁহার কখনো কোন পরিবর্তন নাই, যাঁহার প্রেমসমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা নাই। প্রেম যেন তাহার প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হয়, যেন উহা ভগবানের নিকট পৌঁছায়—যিনি প্রকৃতপক্ষে প্রেমের অনন্ত সমুদ্রস্বরূপ, প্রেম যেন তাঁহারই নিকট পৌঁছায়। সকল নদীই সমুদ্রে গিয়া পড়ে, একটি জলবিন্দুও পর্বতগাত্র হইতে পতিত হইয়া নদীতে থামিতে পারে না, ঐ নদী যত বড়ই হউক না কেন! অবশেষে সেই জলবিন্দু কোন না কোনরূপে সমুদ্রে যাইবার পথ করিয়া লয়। ভগবানই আমাদের সর্বপ্রকার ভাবাবেগের একমাত্র লক্ষ্য। যদি রাগ করিতে চাও, ভগবানের উপর রাগ কর। তোমার প্রেমাস্পদকে তিরস্কার কর, তাঁহাকে ভর্ৎসনা কর; আর কাহাকে তুমি নির্ভয়ে তিরস্কার করিতে পার? মর্তজীব তোমার রাগ সহ্য করিবে না; প্রতিক্রিয়া আসিবেই। যদি তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হও, আমিও অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিব, কারণ আমি তোমার ক্রোধ সহ্য করিতে পারিব না। তোমার প্রেমাস্পদকে বল, 'তুমি আমার কাছে কেন আসিতেছ না? কেন তুমি আমাকে এভাবে একা ফেলিয়া রাখিয়াছ?' ভগবান ছাড়া আর কিসে আনন্দ আছে? ছোট ছোট মাটির ঢিপিতে আর কি সুখ? অনন্ত আনন্দের ঘনীভূত ভাবকেই অন্বেষণ করিতে হইবে—ভগবানই এই আনন্দের ঘনীভূত ভাব। আমাদের সকল ভাবাবেগ যেন তাঁহারই সমীপে উন্নীত হয়। ঐগুলি তাঁহারই জন্য অভিপ্রেত; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে ঐগুলি নীচভাবে পরিণত হয়; সোজা লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিলে অতি নিম্নতম বৃত্তি পর্যন্ত রূপান্তরিত হয়। মানুষের শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি যেভাবেই প্রকাশিত হউক না কেন, ভগবানই ঐগুলির একমাত্র লক্ষ্য—'একায়ন'। মনুষ্যহৃদয়ের সব ভালবাসা—সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকেই যায়; তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ। এই হৃদয় আর কাহাকে ভালবাসিবে? তিনি পরম সুন্দর, পরম মহীয়ান—সৌন্দর্যস্বরূপ, মহত্ত্বস্বরূপ। তাঁহা অপেক্ষা সুন্দর জগতে আর কে আছে? তিনি ব্যতীত স্বামী হইবার উপযুক্ত জগতে আর কে আছে? জগতে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে? অতএব তিনি যেন আমাদের স্বামী হন, তিনিই যেন আমাদের প্রেমাস্পদ হন।

অনেক সময় দেখা যায়, দিব্যপ্রেমে মাতোয়ারা ভক্তগণ এই ভগবৎ-প্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া সর্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাকেই যথেষ্ট উপযোগী মনে করেন। মূর্খেরা ইহা বুঝে না—তাহারা কখনো

ইহা বুঝিবে না। তাহারা উহা কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে। তাহারা এই আধ্যাত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে না। কেমন করিয়া বুঝিবে? 'হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটিমাত্র চুম্বন! যাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত হইয়া থাকে। তাহার সকল দুঃখ চলিয়া যায়। সে তোমা ব্যতীত আর সব ভুলিয়া যায়।'[১] প্রিয়তমের সেই চুম্বন—তাঁহার অধরের সহিত সেই স্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও—যাহা ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়, যাহা মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে। ভগবান যাঁহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাঁহার সমুদয় প্রকৃতিই পরিবর্তিত হইয়া যায়। তাঁহার পক্ষে জগৎ অন্তর্হিত হয়—তাঁহার পক্ষে সূর্যচন্দ্রের আর অস্তিত্ব থাকে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে বিগলিত হইয়া যায়। ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরম অবস্থা।

প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক আবার ইহাতেও সন্তুষ্ট নন। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও তাঁহার নিকট তত উন্মাদক নয়। ভক্তেরা অবৈধ (পরকীয়া) প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ উহা অতিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা তাঁহাদের লক্ষ্য নয়। এই প্রেমের প্রকৃতি এই যে, যতই উহা বাধা পায়, ততই উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা সহজ স্বচ্ছন্দ—উহাতে কোন বাধাবিঘ্ন নাই। সেইজন্য ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন নারী তাঁহার প্রিয়তম পুরুষে আসক্ত, এবং তাঁহার পিতা, মাতা বা স্বামী ঐ প্রেমের বিরোধী। যতই ঐ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই উহা প্রবল ভাব ধারণ করিতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপ লীলা করিতেন, কিরূপে সকলে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিত, কিরূপে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র গোপীরা—সেই ভাগ্যবতী গোপীরা সব-কিছু ভুলিয়া—জগৎ ভুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, সাংসারিক কর্তব্য, সংসারের সুখদুঃখ ভুলিয়া—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মানুষ—মানুষ, তুমি ভগবৎ-প্রেমের কথা বল, আবার জগতের সব অসার বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পার; তোমার কি মন মুখ এক? 'যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকিতে পারে না। যেখানে কাম, সেখানে রাম

---

১ সুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্মরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩১।১৪

থাকিতে পারেন না; এই দুইটি কখনো একত্র থাকে না। আলো এবং অন্ধকার (রবি ও রজনী) কখনো একসঙ্গে থাকে না।'[১]

উপসংহার

যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনীত হওয়া যায়, তখন দর্শনশাস্ত্র ফেলিয়া দিতে হয়, কে আর তখন ঐগুলির জন্য ব্যস্ত হইবে? মুক্তি, উদ্ধার, নির্বাণ—এ-সবই তখন কোথায় চলিয়া যায়! এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত হইতে চায়? 'ভগবন, আমি ধন জন সৌন্দর্য বিদ্যা—এমন-কি মুক্তি পর্যন্ত চাই না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।'[২] ভক্ত বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।' তখন কে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিবে? কে ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা করিবে? ভক্ত বলেন, 'আমি জানি—তিনি ও আমি এক, তথাপি আমি তাঁহা হইতে নিজেকে পৃথক রাখিয়া প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিব।'

প্রেমের জন্য প্রেম—ইহাই ভক্তের সর্বোচ্চ সুখ। প্রিয়তমকে সম্ভোগ করিবার জন্য কে না সহস্রবার বদ্ধ হইবে? কোন ভক্তই প্রেম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না; তিনি স্বয়ং ভালবাসিতে চান, আর চান ভগবান যেন তাঁহাকে ভালবাসেন; তাঁহার নিষ্কাম প্রেম—যেন উজান বাহিয়া যাওয়া। প্রেমিক যেন নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে—স্রোতের বিপরীত দিকে যান। জগৎ তাঁহাকে পাগল বলে। আমি একজনকে জানি, লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত! তিনি উত্তর দিতেন, 'বন্ধুগণ, সমুদয় জগৎ তো একটা বাতুলালয়। কেহ সাংসারিক প্রেম লইয়া উন্মত্ত, কেহ নামের জন্য, কেহ যশের জন্য, কেহ অর্থের জন্য, আবার কেহ বা স্বর্গলাভের জন্য পাগল। এই বিরাট বাতুলালয়ে আমিও পাগল। আমি ভগবানের জন্য পাগল। তুমি টাকার জন্য পাগল, আমি

---

১ জহঁা রাম তহঁা কাম নহীঁ, জহঁা কাম তহঁা নহীঁ রাম।
দুঁহ মিলত নহীঁ রব রজনী নহীঁ মিলত একঠাম।— দোঁহা, তুলসীদাস

২ ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্ বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।। —শিক্ষাষ্টকম, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ঈশ্বরের জন্য পাগল। তুমিও পাগল, আমিও পাগল। আমার বোধ হয়, শেষ পর্যন্ত আমার পাগলামিই সবচেয়ে ভাল।' প্রকৃত ভক্তের প্রেম এই প্রকার তীব্র উন্মত্ততা, উহার কাছে আর সব আকর্ষণই অন্তর্হিত হয়। সমুদয় জগৎ তাঁহার নিকট কেবল প্রেমে পূর্ণ—প্রেমিকের চক্ষে এইরূপই বোধ হয়। যখন মানুষের অন্তরে এই প্রেম প্রবেশ করে, তখন তিনি অনন্তকালের জন্য সুখী, অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যান। ভগবৎ-প্রেমের এই পবিত্র উন্মত্ততাই কেবল আমাদের অন্তরস্থ সংসার-ব্যাধি অনন্তকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে।

প্রেমের ধর্মে আমাদিগকে দ্বৈতভাব আরম্ভ করিতে হয়। ভগবান আমাদের পক্ষে আমাদের হইতে ভিন্ন, আর আমরাও তাঁহা হইতে আমাদিগকে ভিন্ন বোধ করি। প্রেম উহাদের মধ্যে আসিয়া উভয়ের মিলন সম্পাদন করে। তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে আর ভগবানও মানুষের ক্রমশঃ অধিকতর নিকটবর্তী হইতে থাকেন। মানুষ সংসারের সব সম্বন্ধ—যেমন পিতা, মাতা, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রণয়ী প্রভৃতি ভাব লইয়া তাঁহার প্রেমের আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট ভগবান এই সর্বরূপে বিরাজিত। আর তিনি তখনই উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হন, যখন তিনি নিজ উপাস্য দেবতাতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হইয়া যান। আমরা প্রমথাবস্থায় সকলেই নিজেদের ভালবাসি। এই ক্ষুদ্র অহং-এর অসঙ্গত দাবি প্রেমকেও স্বার্থপর করিয়া তুলে। অবশেষে কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হয়, আর এই ক্ষুদ্র 'অহং' সেই অনন্তের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে, দেখা যায়। মানুষ স্বয়ং এই প্রেমজ্যোতির সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যান। তাঁহার পূর্বে অল্পাধিক পরিমাণে যে-সকল ময়লা ও বাসনা ছিল, তখন তাহা সব চলিয়া যায়। তিনি অবশেষে এই সুন্দর প্রাণমাতানো সত্য অনুভব করেন যে, প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একই।